তারাশঙ্কর
বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈতালী-ঘূর্ণি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

তৃতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫২
চতুর্থ সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৪
পঞ্চম সংস্করণ—মাঘ, ১৩৫৫
ষষ্ঠ সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৫৭
সপ্তম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৯
অষ্টম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬১

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীসত্যচরণ ঘোষ
মিহির প্রেস
৯এ, সরকার বাই লেন,
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদপট-শিল্পী,
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দু'টাকা

শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লাভপুর

বীরভূম

অনাবৃষ্টির বর্ষায় খর রৌদ্রে সমস্ত আকাশ যেন মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে; সারা নীলিমা ব্যাপিয়া একটা ধোঁয়াটে কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব। মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বাতাস, হুহু করিয়া একটা দাহ বহিয়া যায়।

গোষ্ঠ মাঠের কাজ সারিয়া দাওয়ায় কোদালখানি রাখিয়া কলিকায় তামাক সাজিয়া টানিতে বসিল; টানিয়াই যায়, আর কি যেন ভাবে।

পত্নী দামিনী হাতাখানা পুড়াইয়া ডালের মধ্যে সশব্দে ডুবাইতে ডুবাইতে কহিল, কি ভাবছ বল তো?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গোষ্ঠ কহে, হুঁ, ভাবছি—ভাবছি কি জান, তুমিও তো অনেক দিন এসেছ, বল দেখি, গাঁ-খানা কি ছিল আর কি হ'ল?

দামিনী কহে, তা সত্যি বাপু, সেই গাঁ—সবারই ঘরে গোলাভরা ধান, যাত্রা, মচ্ছব কত; বছর বছর নটবরের যাত্রা হয়েছে; আর এখন আজ খেতে কারু কাল নাই।

গোষ্ঠ বলে, জান, আজ মাঠ থেকে ফিরতে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে গা শিউরে উঠল। সমস্ত গাঁটা যেন আবছা ধোঁয়াতে ছেয়ে গিয়েছে, নদীর বুকে বাতাসে তপ্ত বালি হুহু করছে, নদীর ওপরেই শ্মশানের ছাই উড়ছে, শেয়াল কুকুর শকুনি চেঁচাচ্ছে; গাঁয়ের মাঝ থেকে একটা সাড়া নাই কারু, যেন সব ম'রে গিয়েছে; আমার বুকখানা কেমন ক'রে উঠল বাপু।

দামিনী ভয়ে শিহরিয়া উঠে, তরুণীটির সদাহাস্যময়ী মুখখানি মলিন হইয়া উঠে, উহারও তরল মনের বুকে ভাবনার বোঝা চাপিয়া বসে।

সত্যই বিভীষিকা জাগে।

গ্রামে ঢুকিতে প্রথমেই একটা নদী।

নদী ঠিক নয়, একটা মরুভূমি, লম্বা একটানা একটা বালুকার প্রবাহ, জল নাই; অন্তত বৎসরের মধ্যে আটটি মাস জলধারা বয় না, বয় একটা অদৃশ্য অগ্নিলীলা, খররৌদ্রে হু হু করে মরীচিকার ধারা।

আর ওই মরীচিকা, ওই নৃত্যশীল অদৃশ্য অগ্নিধারা, ও তো মিথ্যা বা মায়া নয়, ও শুষ্কবক্ষ মাটির তৃষ্ণা; নিদারুণ রুক্ষতায় হাহা করে।

নদীর পরই চরের উপর শ্মশান।

এখানে অগ্নিলীলা অদৃশ্য নয়, রাশি রাশি অঙ্গারে, চিতার লকলকে রক্তরাঙা বহ্নিশিখায় বাস্তবে মূর্ত্ত।

জীবন্তের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, আছে শুধু উত্তাপ, অগ্নি, অঙ্গার, কঙ্কাল, শব।

জীবন্তের মধ্যে, আকাশের বুক হইতে তীক্ষ্ণ চীৎকারে শকুনির পাল শবগুলার বুকে গলিত দেহের লোভে ঝাঁপাইয়া পড়ে, বীভৎস দুর্গন্ধময় বিশাল ডানা দুইখানার ঝাপটে এ উহাকে তাড়ায়, ও উহাকে তাড়ায়।

আর আসে শৃগালের দল, শবগুলার বুকে পা রাখিয়া রক্তহীন মাংসের পিণ্ডে দাঁত বসাইয়া কুকুরগুলা গোঙায়—গোঁ গোঁ।

শৃগালের দল দূরে আর একটা শবের বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। তীক্ষ্ণ রোমাঞ্চকর কোলাহলে চরখানা মুখর হইয়া উঠে। গাছের ছায়ায় পূর্ণ-উদর তন্দ্রাচ্ছন্ন কয়টা কুকুর শবগুলার পানে চাহিয়া থাকে, পূর্ণ উদর, লোভের অন্ত নাই, লোলুপ লোভে মুখগুলা হাঁ করিয়া থাকে, লম্বা করকরে জিভগুলা ঝুলিয়া পড়ে, আর তাহাতে অনর্গল গড়ায় লালসার লালা।

বায়ু, যে বায়ু মানুষের জীবন, সেও এখানে ভয়াল, সেও পাগলের

মত অবিরাম আপন অঙ্গে মাখে চিতার ছাই, গলিত শবের দগ্ধ দেহের বিকট বীভৎস দুর্গন্ধ।

শ্মশানের পরই খান তিরিশেক মাঠ, তাহার পর গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে শ্মশানটা, যেন জীবনের রাজ্যে মরণের অভিযান, পল্লীটার দ্বারপ্রান্ত অবরোধ করিয়া যেন মরণের কটকখানা বসাইয়াছে।

মাঠের ফসল শ্মশানের প্রান্ত পর্যন্ত জাগিয়া উঠে, কিন্তু নীচে শুষ্ক নদীর টানে মাঠের রসটুকু চোঁয়াইয়া ওই রাক্ষসী বালুকা-প্রবাহের বুকে মিশিয়া যায়।

কঠিন রসলেশহীন মাটির বুকে শীর্ণ পাংশুটে গাছগুলি তবু অতি কষ্টে বাঁচিয়া থাকে, যেন শুষ্কবক্ষ কঙ্কালাবশেষ নারীর সন্তান সব; মরণের শোষণে রসময়ী ধরণী মা, সেও বুঝি বন্ধ্যার মত শুষ্কবক্ষা হইয়া উঠিল। বাতাস বয়, সঙ্গে সঙ্গে চিতার ছাই উড়ে; এদিকে গাছগুলা দোলে, উহাদের পাতায় ছাইগুলা জড়াইয়া যায়; যেন মুমূর্ষু জীবন মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করে, শ্মশানটাকে অগ্রগমনে বাধা দেয়।

অন্ধকারের মাঝে প্রেত নাচে; তাই অন্ধকারের মাঝে জীবন্ত মানুষকেও প্রেত বলিয়া ভ্রম হয়, আর প্রেতত্ব পায়ও মানুষ; তাই অন্ধকারের মাঝেই মানুষ চোর, মানুষ ঘাতক। বাহিরের ওই মরণের রাজ্যের ছায়ায় গ্রামখানাও ঠিক যেন মৃতের রাজ্য।

মানুষ তো নয় সব, হাড়-চামড়া ঝরঝর করে, কঙ্কালসার মানুষ অতি ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়; বাড়িঘরের অবস্থাও তাই, দেওয়ালগুলার লেপন খসিয়া গিয়াছে, যেন পঞ্জরাস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে; চালও তাই, খড় বিপর্যস্ত, কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ে পড়ে। অবরুদ্ধ জীবন্তের রাজ্যের টুকরাখানা বুঝি আর থাকে না।

কে রক্ষক?

রক্ষক ভগবান কত দূরে, কে জানে!

লোকে ভগবানকে ডাকেও।

কিন্তু সে ডাক বুঝি ততদূর পৌছায় না।

কিংবা সে বুঝি অতি নিষ্ঠুর।

তবু উচ্চকণ্ঠে ওরা প্রতি সন্ধ্যায় তাকে ডাকে—

"ও তার নামের গুণে গহন বনে, মৃত তরু মুঞ্জরে,

নামের তরী বাঁধা ঘাটে ডাকলে সে যে পার করে।"

ওই বিশ্বাসটুকুর আশ্বাসেই উহারা বাঁচিয়া আছে, ওইটুকুই জীর্ণ স্বর্ণসূত্রের মত এই জীবনের মালাখানি আজও গাঁথিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ও আশ্বাসও আজ অতি ক্ষীণ, অতি দুর্বল; তাই উহারা মুখে বলে, হরি হে, যা কর। কিন্তু মনে ঠিক ওই কথাটা মানিয়া লইতে চায় না, সে কবিরাজের 'ডাক্তোরখানা' পর্যন্ত ছুটায়, বটিকা পাঁচন মুখ খিঁচাইয়া গিলায়!

বাঁচিলে দেবতার পূজা দেয়; না বাঁচিলে বলে, পাথর, পাথর, দেবতা-ফেবতা মিছে কথা।

মোট কথা, ভগবানকে উহারা মানে, কি মানে না, সেটা আজ একটা অমীমাংসিত সমস্যা।

ডাকিতেও মন চায় না, না ডাকিলেও মন খুঁতখুঁত করে।

উপলব্ধ সত্য আর যুগযুগান্তের সংস্কারে এখানে প্রবল দ্বন্দ্ব; ব্যর্থতায় বুকের ভিতর ক্ষোভ জাগিয়া উঠে—সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ঝ'ড়ো হওয়ার মত।

কিন্তু সে চৈত্র-প্রান্তরের ঘূর্ণির মতই ক্ষীণ আর ক্ষণস্থায়ী, উঠিয়াই মিলাইয়া যায়।

শ্মশানখানা যেন দিন দিন আগাইয়া আসিতেছে। সুদূর

আফগানিস্থানের কাবুলীর দল শকুনির মত তীক্ষ্ণ চীৎকারে খাটো খাটো বাংলায় হাঁকে, এ গুষ্ঠা মুড়ার, আরে এ—

দামিনীর তখন ওই বিভীষিকাময়ী ভাবনায় দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে কহিতেছিল, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে, তোমার হ'ল তাই। গাঁয়ের ভাবনা ভাবতে লাগলে—

সহসা বাহির হইতে ওই কাবলীওয়ালার ডাক।

দামিনী কহে, ওই নাও, যা বলছিলাম তাই, এখন কি করবে কর।

বাহির হইতে হাঁক আসে, এ গুষ্ঠা, আরে এ—! সঙ্গে সঙ্গে দরজায় লাঠিগাছটা ঠোকে, ঠকঠক।

গোষ্ঠের দেশের ভাবনা কোথায় উবিয়া যায়, হুঁকা টানিতে টানিতে সে আঁতকাইয়া উঠে।

আবার লাঠি ঠোকার শব্দ হয়।

গোষ্ঠ অতি সন্তর্পনে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া কোণে লুকাইয়া বসে, হুঁকা পর্যন্ত টানে না।

দামিনীও সঙ্গে সঙ্গে যায়; দামিনীর বুকখানা গুরগুর করিয়া উঠে, বলে, কি হবে গো?

গোষ্ঠ ফিসফিস করিয়া বলে, বল ঘরে নাই।

দামিনী চাপা গলায় তাড়াতাড়ি বলিল, না না, আমি পাবব না। গোষ্ঠ হাতজোড় করিয়া মিনতি করে, হেই গো, তোমার পায়ে পড়ি।

দামিনী স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তিরস্কার করে, ছি, কি বল তার ঠিক নাই; আক্কেলের মাথা খেয়েছ একেবারে?

ওদিক হইতে আবার হাঁক আসে, আরে এ গুষ্টা, হারামজাদ, বদমাস, বাহার আসো।

গোষ্ঠ আবার কাকুতি করিয়া বলে, লক্ষ্মীটি, বল, বল, নইলে বেটা আবার ঘরে ঢুকবে।

দামিনীর বুক গুরগুর করে, সে, চাপা গলায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠে, তখন যে কাপড় কিনতে মানা করেছিলাম! ধারে পেলেই কি হাতী কিনতে হয়?

গোষ্ঠ বলে সে তো তোমার জন্যই—

দামিনী জ্বলিয়া যায়, কিন্তু কিছু বলিবার আগেই দরজার মুখে নাল-মারা নাগরা আওয়াজ দিয়া উঠে।

দামিনী তাড়াতাড়ি ঘরের দরজায় শিকল দিয়া বাহিরে আসিয়া ঘোমটা টানিয়া মৃদুকণ্ঠে বলে, ঘরে নাই গো।

ভাঙা বাংলায় তীক্ষ্ণকণ্ঠে কাবুলী কয়, আরে, তুমি কৌন্ আসো, তুম্হি—

দামিনী ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, গলা দিয়া আওয়াজ বাহির হয় না। তাড়াতাড়ি শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিতে চায়, দেখে ভিতর হইত খিল আঁটা।

ওদিকে নাগরার আওয়াজ উঠানের বুক অবধি আগাইয়া আসে।

দামিনী ভয়ে এক পাশে সরিয়া দাঁড়ায়।

কাবুলী কয়, তুমি কৌন্ আসো? উস্কো কৌন্? জরু? বহু আসো?

দামিনী ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ।

কাবুলী কয়, তব তো তুম্হি টকা দিবিস; পন্‌রা টকা, পন্‌রা টকা—দশ আওর পান লিয়ে আন।

দামিনীর গলা শুকাইয়া যায়, তবু আর্তস্বরে কহে, ঘরে নাই, আসুক।

কাবুলী দাঁত বাহির করিয়া বলে, তব তুম আসো, তুম্‌কো লিয়ে যাবে।

দামিনী ভয়ে চেঁচাইয়া উঠে।

কাবুলী হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়, আপন ভাষায় গোটা জাতটাকে গালি দেয়।

দামিনী কাঠ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকে, চোখ দিয়া জল পড়ে, তবু সে চোখ আগুনের মত জ্বলে।

কতক্ষণ পর দরজা খুলিয়া গোষ্ঠ বাহিরে উঁকি মারিয়া বলে, গিয়েছে বেটা শকুনি ?

দামিনী কথা কয় না, চোখের জলের প্রবাহ দ্বিগুণ হইয়া বয়, মুখখানা কঠিন হইয়া উঠে।

গোষ্ঠ আড়-চোখে দামিনীর মুখপানে তাকাইয়া কয়, একদিন এমন ঠেঙান ঠেঙাব।

এই নির্লজ্জ আস্ফালন কানে আগুনের হল্কার মতই ঠেকে, সে মাটির উপরেই সজোরে থুৎকার নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

ঘরের ভিতরে পাঁচ বছরের ছেলেটা জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চেঁচায়, ক্ষিঁধে লেঁগেচে—এঁ—এঁ—এঁ—।

দামিনী তীব্রকণ্ঠে বলে, মর, মর, আমার হাড় জুড়োক।—বলিয়া একথালা মুড়ি সশব্দে ছেলেটার মুখের কাছে নামাইয়া দিয়া আবার বলে, নাও, গেলো, গিলে যমের বাড়ি যাও।—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চোখ মোছে, কিন্তু সে জল মুছিয়া শেষ করিতে পারে না।

গোষ্ঠ সভয়ে কহে, মুড়ি কেন ? সাবু সাবু—

দামিনী কথা কাড়িয়া বলে, সাবু আমি রোজগার ক'রে আনব, নয় ?

গোষ্ঠ চুপ করিয়া যায়, ক্ষণেক পর আপন মনেই কয়, তা পুরনো জ্বর বটে, তা খা, দুটো মুড়ি খা। কত আর সাবু খাবি ?

ছেলেটা কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হয় না, মুড়ি ছড়াইয়া ফেলিয়া চেঁচায়, ভাঁ—আঁ—আঁ—ত খাঁ—আ—বো ও—ও

চীৎকারে বিরক্ত হইয়া গোষ্ঠ উঠিয়া যায়।

কোথায় যাইবে ? নিরানন্দ এ পুরীতে কোথায় আনন্দ ? গোষ্ঠ মাঠের পথ ধরে, ওই হেথায় গিয়া আশার আলো নজরে ঠেকে, শেষ আষাঢ়ের সবুজ মাঠ, কচি কচি লকলকে ঘন সবুজ ফসলের ডগাগুলি হেলে দোলে আর যেন কত কথা বলে, ধানের ডগাগুলি যেন বলে—

"ধান, ধান, ধান—ধানে রাখবে জান,
ঋণ শোধিব খাজনা দিব
ধানে রাখবে আমার মান
নতুন বস্ত্র পুরনো অন্ন
এই যেন খেতে পাই জন্ম জন্ম।"

গোষ্ঠ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ঘন সবুজ ধানের পানে তাকাইয়া থাকে। ইচ্ছা করে, এইখানেই দিবারাত্রি কাটাইয়া দেয়।

ওদিক হইতে আখের পাতাগুলি ইশারা করিয়া দুলিয়া দুলিয়া যেন ডাকে, গোষ্ঠ আগাইয়া চলে, আর আপন মনেই গুনগুন করিয়া বলে—

"কাজুলি রে কাজুলি,
তোর পায়ে এবার আমার
বউ পরাবে মাদুলি।"

তকতকে নিড়ানো ক্ষেতে বসিয়া গোষ্ঠর বিনা কাজে হাতে করিয়া ভূরার মত গুঁড়া মাটি পায়ে, সারা অঙ্গে মাখিতে ইচ্ছা করে।

মাঠের আলপথে ভিন্ গাঁ হইতে দোকান সারিয়া ফিরিতেছিল

ভোলা ময়রা। সে কহিল, কি গোষ্ঠ, রোদে বসে কি হচ্ছে? সত্য কথা বলিতে কেমন লজ্জা করে, আমতা আমতা করিয়া বলে, এই খুড়ো, ব'সে আছি।

ভোলা খুড়া কহে, সে আমলের খেপা মোড়লের মত ধান বাড়াচ্ছিস নাকি? খেপা মোড়ল কি করত জানিস? দিনে, দুপুরে, সন্ধ্যেয় বাড়ির কাজে খোলসা পেলেই মাঠে এসে নিজের ধানের ডগায় হাত দিয়ে বলত কন্—কন্,—ওঠ্—ওঠ্—, কন্ কন্—কন্ ক'রে বেড়ে ওঠ্। আর পরের ধানের মাথায় হাত দিয়ে হাত নীচে দিয়ে নামিয়ে বলত, কন্—কন্—কন্, ব'সে যা, নেমে যা।

গোষ্ঠ গল্প শুনিতে শুনিতে ভোলা খুড়ার সঙ্গ ধরিয়াছিল! গোষ্ঠ কহিল, খুড়ো, খেপা মোড়লের অবস্থা বুঝি ভাল ছিল না? খুড়া চ্যাঙারিসুদ্ধ মাথা ঘুরাইয়া গোষ্ঠর পানে তাকায়; তারপর বলে, হ্যাঁ, অবস্থা তার ভাল ছিল না, তবে আজকালকার সবার চেয়ে ভাল ছিল।

গোষ্ঠ কহে, আচ্ছা খুড়ো সে সব ধান ধন গেল কোথা বল দেখি? ঠিক পাশের আখের খেতটার ভিতরে শব্দ উঠে মড়মড় খসখস; গোষ্ঠ কহে, কে, আখ ভাঙছে কে রে, কে? কচি আখ ভাঙে কে?

ভিতর হইতে সে লোকটা হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠে, তোর বাপ রে, হারামজাদ।

গোষ্ঠ কিল খাইয়া কিল চুরি করে, গালিটা নির্বিবাদে হজম করিয়া চলে, গতিটা একটু বাড়াইয়া দেয়, আপন মনেই বলে, বাঘে ধান খায়, তো তাড়ায় কে? ভাঙ বাবা, জমি শুদ্ধু তুলে নিয়ে যাও।

যে লোকটা আখ ভাঙিতেছিল, সে জমিদারের চাপরাসী। খুড়া খানিকটা আগাইয়া আসিয়া কহে, দেখলি গোষ্ঠ, ধন ধান গেল কোথা? ওই দশজনে লুটেই খেলে।

গোষ্ঠ ও কথাটার উত্তর দেয় না, আপন মনেই বলে, দেবতা-ফেবতা মিছে কথা—মিছে কথা খুড়ো, ওসব আঁকা চোখে ফাঁকা চাউনি, দেখতে কেউ পায় না।

মোড় ফিরিবার মুখে খুড়া কহে, চ্যাঙারিটা একবার নামিয়ে ধর তো গোষ্ঠ।

গোষ্ঠ চ্যাঙারিটা নামাইয়া ধরিলে একমুঠা বাতাসা লইয়া খুড়া গোষ্ঠর আঁচলে দিয়া বলে, ছেলেটাকে দিস। ক্ষণিকের এই ক্ষীণ সহানুভূতিতে গোষ্ঠর প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

* * *

ওদিকে ছেলেটা ভাত খাইবার বায়নায় কাঁদিতে কাঁদিতে নেতাইয়া পড়ে। দামিনী দাওয়ার উপর কাঠের মত বসিয়া ছিল, সহসা সে ছেলেকে কোলে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরে।

চোখের প্রবাহ প্রবল হয় ; মনে মনে শতবার ষষ্ঠিকে স্মরণ করিয়া ছেলের মাথায় সে হাত বুলায়।

ছেলেটা তবু কাঁদে, ভাঁ—আঁ—ত খাঁ—বো—ও।

স্নেহসর্বস্বা অশিক্ষিতা নারীর মন বলে, আহা, দুটি খাক। পুরনো জ্বরে তো লোকে খায়। ভাত খাইয়া ছেলেটার ক্ষুধার কান্না থামে কিন্তু যাতনার কান্না বাড়ে, বমি হয়, জ্বর বাড়ে।

মায়ের মন সেই গাল দেওয়ার কথাই স্মরণ করে ; ভাতের কথাও মনে হয়, কিন্তু সে যে এত কয়টি, মাত্র দুইটি গ্রাস।

গালটাই মনে প্রবল হইয়া জাগে, দেবতার উদ্দেশে মাথা ঠুকিয়া কপালটা ফুলিয়া উঠে।

কিন্তু সে যে নারী! ডাকিবে যে, সে কোথায় কোন্ আড্ডায় একটু তামাকের আশায় স্ত্রী-পুত্র সব ভুলিয়া বসিয়া আছে!

ব্যাকুল মন সঙ্গে সঙ্গে বিষাইয়া উঠে, সে বিষের ঘোরে ভাল মন্দ জ্ঞান যেন সব লোপ পায়।

তাই যাহাকে সে দূরে রাখিতে চায়, যাহার পরম দাস্যভাব সে ঘৃণা করে, সেই সুবল দাসের কাছে ছুটিয়া গিয়া হাতের পৈঁছা জোড়াটি খুলিয়া দিয়া কাকুতি করিয়া কহিল, আমাকে দুটি টাকা দাও, আর কবরেজকে একবার ডেকে দাও।

তরুণ সুবল মুগ্ধদৃষ্টিতে দামিনীর মুখপানে তাকাইয়া আবার সলাজে মুখ নামাইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, পৈঁছে তুমি রাখ, টাকা আমি দিচ্ছি।

বিষের ঘোরের মাঝেও যাতনার দাহে চেতনা ফিরিয়া আসে, সুবলের সহানুভূতি দামিনীর বুকে সেই দাহের কাজ করিল, দামিনী ঝাঁজাইয়া উঠিল, শুধু তোমার টাকা নোব কেন আমি?

সুবল বিবর্ণ হইয়া অনুনয় করিয়া কহিল, সধবা মানুষ তুমি, খালি হাতে—। সুবলের জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল।

জীর্ণ কাপড়ের পাড়খানি ঝাঁঝের মুখে এক হাত ছিঁড়িতে, তিন হাত ছিঁড়িয়া হাতে জড়াইয়া কহিল, এই আমার সোনার কাঁকন, তোমার পায়ে পড়ি মহান্ত; এ দুটো নিয়ে আমাকে দুটো টাকা দাও, ছেলেটা বুঝি আর বাঁচে না। দীপ্ত কণ্ঠস্বর স্নেহের দুর্বলতায় ভাঙ্গিয়া পড়িল, চোখের কোলে কোলে জল টলটল করিয়া উঠিল।

সুবল ব্যস্ত হইয়া পৈঁছা জোড়াটি ঘরে তুলিয়া টাকা আনিয়া দামিনীর হাতে আলগোছে দিতে গেল, কিন্তু কেমন হাত কাঁপিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট টাকা দুইটি মাটিতে পড়িয়া গেল। সুবল লজ্জায় একরূপ ছুটিয়া পলাইল, কহিল, কবরেজকে ডেকে আনি আমি।

ঘর-দ্বার সব খোলা পড়িয়া রহিল।

দামিনী শেষে দরজায় শিকলটা তুলিয়া দিয়া বাড়ি ফিরিল।

মনটা কিন্তু কেমন ছি-ছি করিতেছিল।

একের লজ্জা অপরকেও লজ্জিত করে যে সংক্রামক ব্যাধির মত; যাহাকে দেখে তাহার লজ্জায় যে দেখে সেও লজ্জা পায়, হউক না কেন দ্রষ্টার মন ফুলের মত পবিত্র।

দামিনী ওই কথাই ভাবিতে ভাবিতে ফিরিতেছিল। বাড়ির দুয়ারে তাহার চমক ভাঙিল একটা কাঁসার মত তীক্ষ্ণ উচ্চ কর্কশ কণ্ঠ শুনিয়া।

লোকটা উচ্চকণ্ঠে কহিতেছিল, ও চালাকি চলবে না হে বাপু, সুদের টাকা আমাকে মাস মাস মিটিয়ে দেবার কথা, দাও, দিতে হবে।

লোকটা মহাজন।

দামিনীর সর্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল।

দামিনী ভাল ঘরের মেয়ে, পড়িয়াছিলও ভাল ঘরে।

গোষ্ঠর অবস্থা চিরদিনই এমন ছিল না. তাহার বাপের আমল পর্যন্তও গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গাই, পুকুর-ভরা মাছ—পল্লীর ঐশ্বর্য যা কিছু সবই ছিল।

কিন্তু সে শ্রী আর নাই, সব গিয়াছে।

থাকে কি করিয়া? মূল মরিলে কি ফুল বাঁচে!

পল্লার শ্রীই যে গিয়াছে।

এখন অভাবের মাঝে শুধু অতীতের প্রাচুর্যের স্মৃতিই সম্বল; ছেলেকে পর্যন্ত ওই স্মৃতিকথার মালায় সান্ত্বনা দেয়—

আয় চাঁদ আয় আয়, গাই বিয়ালে দুধ দোব,
ভাত খেতে থালা দোব, রুইমাছের মুড়া দোব,

আম-কাঁঠালের বাগান দোব, চাঁদের কপালে
একটি চিত দিয়ে যা।'

*　　　*　　　*

দামিনী এ বাড়িতে আসিয়াছিল আট বছরেরটি ; আজ বয়স তাহার বাইশ। ইহারই মধ্যে এই সংসার কতরূপেই না তাহার চোখের উপর ফুটিল! প্রথম প্রথম এ গৃহ কারা মনে হইয়াছে, মায়ের জন্য কাঁদিয়া দিন গিয়াছে ; তারপর এ সংসার কৈশোরের প্রারম্ভে যেন পুষ্পিত উদ্যান, স্বামী কত ভালবাসিয়াছে, কত গোপন উপহার, মনসার মেলায় গভীর রাত্রে ঘুমন্ত দামিনীর মুখে গরম বেগুনি গুঁজিয়া দেওয়া।

দামিনী জাগিয়া উঠিয়া কহিত, দূর!

গোষ্ঠ কহিত, আমি তো দূর, ওদিকে তো বেশ মুড়মুড় শব্দ উঠছে।—বলিয়া ঠোঙা সুদ্ধ সম্মুখে ধরিত।

দামিনী হাসিয়া ফেলিত।

গোষ্ঠ সম্মুখে মেলিয়া ধরিত কত উপহার—ফিতে, চিরুনি, তেল, আয়না, সাবান।

দামিনী আয়নাখানা তুলিয়া মুখের সামনে ধরিত।

গোষ্ঠ হাসিয়া কহিত, নিজের রূপ কি নিজে দেখে, পরকে দেখতে হয়।

দামিনীর মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিত, কানের পাশ-পর্যন্ত গরম। সে আয়নায় মুখখানা ভাল করিয়া ঢাকিত।

গোষ্ঠ কহিত, রাত্রে আয়না দেখলে কি হয় জান তো?

কি?

কলঙ্ক।

দামিনী চট করিয়া আয়নাখানা ঘুরাইয়া গোষ্ঠর মুখের সামনে ধরিত।

গোষ্ঠ কহিত, আমি চোখ বন্ধ করেছি।

দামিনী গলা জড়াইয়া ধরিয়া চোখ খুলাইবার কত চেষ্টা করিত। শেষে মিনতি করিয়া কহিত, লক্ষ্মিটি চোখ খোল।

গোষ্ঠ চোখ খুলিলে দামিনী কহিত, এইবার ?

কি ?

তোমারও কলঙ্ক হবে।

আমরা পুরুষ, সোনার গয়না, কলঙ্ক আমাদের হয় না, বিপদ তোমাদের।

দামিনী হাসিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া কহিত, ভারি-বুদ্ধি! ওই জন্যে বুঝি আয়না দেখালাম ?

তবে কি ?

কলঙ্ক হয় তো তোমার সঙ্গেই হবে, তোমাকে সাথী ক'রে রাখলাম।

দূর, আমি তোমার আয়ান ঘোষ।—গোষ্ঠ ইঙ্গিত করিয়া হাসিত।

দামিনী আবার রাঙ্গা হইয়া কহিত, চোরের মন পুঁইমাচাতে, কলঙ্ক বুঝি আর কিছু হয় না ?

কি শুনি ?

এই লোকে বলবে, অমুক কি মেগো, আর মাগীও কি জানে বাপু, অত বড় জোয়ানটাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে গো!

তা কর নি নাকি ?—বলিয়া গোষ্ঠ পত্নীকে বক্ষে টানিয়া লইত।

সে একদিন গিয়াছে। এখনও সেদিন মনে পড়িলে দামিনীর চোখ ছলছল করে।

তারপর এই ভরা যৌবনেই অভাবের দাহে সুখের ঘর পুড়িয়া গেল। উত্তাপে বুঝি প্রেমের স্রোতও শুকাইয়া গেল।

গোষ্ঠও মনের মত কিছু দিতে পারে না বলিয়া মরমে মরিয়া থাকে,

অমনোমত কিছু দিতেও মন উঠে না। দামিনীও তাহা বুঝে, তাই সেও কিছু চায় না।

কিন্তু তাহাও গোষ্ঠর প্রাণে বাজে, সে ক্ষুণ্ণস্বরে কয়, কখনও দেখলাম না যে, কিছু চাইলে তুমি।

একমুখ হাসি ভরিয়া দামিনী কয়, বা, বেশ লোক তো তুমি, না দরকার হ'লেও চাইতে হবে? কি নাই আমার, সবই তো রয়েছে।

হাসিটি ছলনার সত্য, কিন্তু বড় সুন্দর, গোষ্ঠ অতৃপ্ত নয়নে মুখপানে চাহিয়া থাকে।

তারপর আপন মনেই নিজের সামর্থ্যের সঙ্গে দামিনীর অভাবের সূচী মিলাইয়া যায়, শেষে বাহির করে একখানা গায়ের কাপড়; কাবুলীর কাছে ধারে পাওয়া যাইতে পারে, তাই সে বলে, কই, গায়ের র‍্যাপার তো নাই তোমার!

দামিনী তাড়াতাড়ি কয়, না না, ও আমি গায়ে দিতে নারি; মাগো, যে সুঁড়সুড়ি! ও কিনো না তুমি।

গোষ্ঠ মানে না, কিনিয়া আনে।

দামিনী ঝগড়া করে, বললাম, এনো না।

গোষ্ঠ অপ্রস্তুতের মত কয়, রাগ কেন, আনলাম। আবার কখনও বা দুইটা আম, দুইটা কাঁঠাল কিনিয়া আনে, কিন্তু দামিনী তাহা খায় না, স্বামী-পুত্রকেই বাঁটিয়া দেয়।

গোষ্ঠ অনুযোগ করিয়া কয়, আমাকে কেন, তোমার তরে আনলাম।

এই স্নেহে দামিনীর চোখে জল আসে, তবু সে হাসিয়া কয় তুমি খাও, আমার আছে।

গোষ্ঠ প্রতিবাদ করে, এ তো আমাকেই সব দিয়েছ, তুমি—

তাড়াতাড়ি কথাটা শেষ করিয়া ফেলিবার অভিপ্রায়ে দামিনী বলিয়া উঠে, ও আমি খেতে পারি না।

সঙ্কোচে মন শুধু সঙ্কুচিত হয় না, শঙ্কিতও হয়! গোষ্ঠও নিজের অমনোমত উপহারের জন্য শুধু সঙ্কুচিতই হয়, প্রত্যাখ্যানের শঙ্কায় শঙ্কিতও হইয়া থাকে। তাই সে ভাবে, এঅরুচি দামিনীর রসনায় নয়, তুচ্ছ বলিয়া তাচ্ছিল্যের অরুচি এ!

এ তাচ্ছিল্য মনে বড় লাগে, ক্ষোভে দুঃখে অন্তর মথিয়া বিষ ফেনাইয়া উঠে, গোষ্ঠ মুখের আহার সার-ডোবায় ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া যায়। দামিনীর মনে হয়, আম ফেলিয়া দিল না, আমাকেই ফেলিয়া দিল। চোখে জল আসে, অন্তর জ্বলিয়া যায়।

এমনই নিরন্তর দাহে উত্তপ্ত অঙ্গার বুকের মাঝে স্তূপ বাঁধিয়া উঠে, শ্মশানের অঙ্গার-স্তূপের চেয়ে সে কম নয়।

এই অশান্তির মাঝে আর এক দারুণ অশান্তি জুটিয়াছিল প্রতিবেশী সুবল দাস। আট বছরের বউ দামিনী যখন এ বাড়ি আসে, তখন তাহারও ঠিক অমনই বয়স।

আট বছরের বউ ঘোমটা টানিয়া বসিয়া আছে, ফুটফুটে ছেলেটি আসিয়া মুখের ঘোমটা খুলিয়া ডাকিল. বউ!

দুইজনেই ফিক করিয়া হাসিল।

তারপর। ছেলেতে ছেলেতে মিতালি হইতে কতক্ষণ!

ঠিক মিতা নয়, বাউটির দাস হইল সে; ফুল তুলিয়া, ফল পাড়িয়া বউটির মন যোগানই ছিল তাহার কাজ।

সুবল দামিনীকে প্রথম দিনই ডাকিয়াছিল, বউ! এখনও তাই বলে।

দামিনী বলিত, সুবলো। এখন বলে মহান্ত।

বাউলের ছেলে সুবল দাস, মহান্ত খেতাব তাহাদের।

কৈশোরের প্রারম্ভে দামিনীর দেহে যৌবনের মুকুল দেখা দিলে গোষ্ঠ আসিয়া তাহার হাত ধরিল, দামিনীরও তাহা লাগিল ভাল ; সে গোষ্ঠর পানেই মুখ ফিরাইল।

তখন এই লাজুক কিশোরটি দামিনীর পানে, বিদায়-নেওয়া প্রিয়জনের পানে মানুষ যে দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, তেমনই সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সে দৃষ্টি দেখিয়া দামিনীর করুণা হইত।

ফাঁক পাইলেই সুবল আসিয়া কহিত, বউ, কুল পাড়তে যাবে ভাই ?

এদিক ওদিক চাহিয়া দামিনী কহিত, না ভাই, বকবে।

সুবল নতদৃষ্টিতে চলিয়া যাইত, দামিনীর তাহাও প্রাণে বাজিত, সে ডাকিয়া কহিত, আমাকে দুটো দিয়ে যাস ভাই, আমি খাব।

সুবল কৃতার্থ হইত।

আঁচল ভরিয়া পাকা জাম, কাঁচা আম, ট'কো কুল সুবল গোপনে আনিয়া দিত ; দামিনী হাসিমুখে গ্রহণ করিয়া কাঁচা আমে কামড় মারিয়া শিহরিয়া উঠিয়া কহিত, মাগো, কি টক ! টাকরায় সে টোকার মারিত। সুবল তাড়াতাড়ি দামিনীর আঁচল টানিয়া বাছিয়া একটা আম লইয়া কহিত, এইটে খাও, কাঁচামিঠে আম, কাঁকুড়ের মত।

কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে সম্মোহনের আবেশময় রাজ্যে উভয়ে প্রবেশ করিতেই দুইজনের এই প্রীতি কেমন টুটিয়া গেল।

দামিনীর মনে হইল, ওই শান্ত লোকটির একান্ত মুগ্ধ দৃষ্টির দীপ্তি যেন বড় প্রখর, দীপ্তিতে যেন একটা দাহ। সে দাহ দামিনী তাহার সর্বদেহে অনুভব করিল।

সুবলের পরম দাস্যতা-ভরা ব্যবহারের মাঝে একটা সবল শক্তি যেন দামিনীকে আকর্ষণ করিল ; তাহার ওই সলাজ নীরবতার মাঝে যেন একটা অতি ব্যগ্র চাওয়ার বাণী দামিনীর কাণে বাজিত !

দামিনী শিহরিয়া সুবলকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দিল, কথা কম কহিল, কণ্ঠ মৃদু করিল, পরের বধুত্বের আড়াল দিয়া উভয়ের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি করিল।

সুবল দেখিল, দামিনী পর হইয়া গেল।

শাস্ত্রে বলে, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ, কিন্তু সুবল দেখিল, ভিক্ষায়াং বসতে লক্ষ্মী।

বাউলের ছেলে সুবল গান গাহিয়া ভিক্ষা করে, গায়ে আলখাল্লা, পায়ে নূপুর, হাতে তাহার একতারা।

ভিক্ষার চাউলে তার পাঁচ-সেরি ঝোলাটা ভরিরা উঠে ; একটা পেটে লাগে আর কত—বড় জোর একসের, বাঁচে চার সের।

ওই চার সের জমিয়া জমিয়া ভিক্ষুককে মহাজন পর্যায়ে দাঁড় করাইয়া দিল।

লোকে বলে, মহান্ত, আর কেন ?

মহান্ত হাসিয়া বলে, বাপরে, পিতিপুরুষের বেবসা, কুলকর্ম, ও কি ছাড়তে আছে ?

দামিনীর দুঃখের দিনে কিন্তু সুবল সত্য সত্যই মহাজন হইতে ভিক্ষুক পর্যায়ে নামিতে চাহিল ; কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলা যায় না ! আর বুকে বাঁধিয়া তাহার সঞ্চয় সম্বল দামিনীর পায়ে ঢালিয়া দিতে সাহস হয় না। হয়তো দামিনী লাথি মারিয়া ফিরাইয়া দিবে।

প্রথম প্রথম সে লুকাইয়া কুলুঙ্গির উপরে, কোন দিন বা চৌকাঠের ফাঁকে, দুয়ারের প্রবেশমুখেই টাকাটা সিকিটা রাখিয়া আসিত।

দামিনীর নজরে ঠেকিলে সে লইয়া আঁচলে বাঁধিত, আর আপন মনেই বকিত, এই আলবোডেমিতেই তো গেল সব ; কাজ দেখ দেখি, কুলুঙ্গির ওপরে টাকা, যদি কেউ দেখতে পেত!

ওটুকুও কিন্তু সুবলের সহ্য হইত না, আর অসহ্য হইত যখন গোষ্ঠ আসিত।

দামিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া স্বামীকে কহিত, কারও কিছু হারিয়েছে ?

গোষ্ঠ চমকিয়া স্মরণ করিতে চাহিত, জিনিসটা কি ? শেষে বলিত, হ্যাঁ হারিয়েছে, আমার—

কি ?

আমার মন।

দূর। সে তো আমারই, দত্ত জিনিসে স্বত্ব কি ? এই দেখ।— বলিয়া সে বাঁধা খুঁট দেখাইত। গোষ্ঠ অবাক হইত, আবার ভাবিত, হবে হয়তো, বনিয়াদি ঘর তো, কোন পিতৃপিতামহের সঞ্চয় ইঁদুরে কোন গর্ত হইতে বাহির করিয়াছে। চোখে জল আসিত।

সুবলের কাছে সমস্ত সংবাদ তিক্ত হইয়া উঠিত।

সর্বস্ব দিয়াও সুবল আপনার হওয়ার সুযোগ পাইল না।

কখনও কখনও সাহস করিয়া নতমুখে গিয়া কহিত, বউ!

রুক্ষস্বরে উত্তর আসিত, কি কাজ কি, আগুন নেবে নাকি ?

সব সুবলের হারাইয়া যায়, ঝঙ্কারের ঝঞ্ঝায় সব বিপর্যস্ত হইয়া যায়। তবু চুপ করিয়া থাকাও তো হয় না। অতি কষ্টে সে কহে, হ্যাঁ।

দামিনী হাতার টানে আগুন টানিয়া ফেলিয়া দিয়া কহে, নেবে কিসে ? কি আবাঙ তুমি, সঙ নাকি ? সঙ্গে সঙ্গে হাসেও ; সুবলের অবস্থা দেখিয়া না হাসিয়া পারে না।

প্রতিবেশিনী সাতু-ঠাকুরঝি আসিয়া বলে, কে লো ?

দামিনী কহে, ওই দেখ না মাইরি, আগুন নেবে, তা শুধু হাতে এসেছ ; দিই কিসে বল তো ?

সাতু বেশ ভাল মানুষের মতই বলে, ভিক্ষের বোঝাটা আন গিয়ে মহান্ত, আগুন নিয়ে যাবে।

দুই সখী দুইজনের মুখপানে চায়।

এই অবসরে সুবল রণে ভঙ্গ দেয়, সহসা পিছন ফিরিয়া পলায়।

দুই সখীতে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে।

সাতু বলে, মরণ! বোবা পুরুষ কি ভাল নাকি, ও বিধেতার অলক্ষণে ছিষ্টি।

* * *

বাড়ির বাহির হইতেই উচ্চকণ্ঠে শোনা যাইতেছিল, ও চালাকি চলবেনা হে বাপু, সুদের টাকা আমাকে মাস মাস মিটিয়ে দেবার কথা ; দিতে হবে, দাও।

গোষ্ঠর মৃদুকণ্ঠ শোনা গেল, বর্ষার ক'মাস মাপ করুন দত্ত মশায়, ক'মাস নারব।

দত্ত, রসিক দত্ত গ্রামের মহাজন, লোক কহে মহাযম। তীক্ষ্ণদন্ত শৃগালের মতই কঙ্কাল-ঢাকা চামড়াটুকু লইয়া টানাটানি করে ; দত্ত তীক্ষ্ণ চীৎকার করিয়া উঠিল, গা জল হ'য়ে গেল মাইরি ; কাঁদুনি ছাড়, টাকা আন!

দামিনী ধীরে ধীরে আসিয়া দাওয়ার উপর উঠিল ভিতরে ছেলেটা জ্বরে গোঙাইতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাহার পা উঠিল না, দুনিয়া ভুলিয়া শঙ্কিত বক্ষে দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়াই রহিল।

গোষ্ঠ কাকুতি করিয়া কহিল, দোহাই দত্ত মশায়, খেতে জুটছে না—

দত্ত ভেঙাইয়া কহিল, খেতে জুটছে না তো আমার কি রে জোচ্চোর? খেতে জুটছেনা!

ভঙ্গীতে সে কি বীভৎস, কণ্ঠস্বর সে কি নির্মম!

দত্তর খর জিহ্বা সাপের জিহ্বার মতই তীক্ষ্ণ, ঘন ঘন লকলক করিয়া নড়ে।

ঘটি-বাটি বাঁধা দাও, না হয় পরিবারের শাঁকা-খাড়ু বেচ, কোথা পাবে সে আমার দেখবার দরকার নাই; আমার পাওনা আমায় পেতে হবে, দাও।

গোষ্ঠ জোড়হাত করিয়া কাঁদিল।

দত্ত কহিল, বেটারা শুধু কাঁদতেই জানে।

কথাটা ঠিক।

চিরনত যে দুর্বাদল সে পদদলনে পত্রপুষ্প হারাইয়া বিদ্রোহ করে, শুষ্ক তৃণাঙ্কুর পায়ে ফোটে।

এরা কিন্তু তাহাও পারে না; হয়তো বুঝিবা বুকের মাঝে রাগও জাগে না। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সমাজে রাষ্ট্রে পিষ্ট হইয়া বুঝি পাষাণ হইয়া গিয়াছে। না; পাষাণ রৌদ্রে আগুনে উত্তপ্ত হয়।

ইহারা তবে কি? ইহারা প্রকৃত স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, অস্বাভাবিক ইহারা। মানুষের সৃষ্টি-করা সভ্যতার চাপে ধ্বংস-হওয়া মানুষের তুলনা বিধাতার সৃষ্টির মাঝে নাই।

গোষ্ঠ কাঁদিয়াই কহিল, ওই দেখুন, পয়সা অভাবে ছেলেটা ওষুধ পায় নাই।

পাথর জলে গলে না, দত্ত খিঁচাইয়া উঠিল, তা সে পয়সাও আমাকে লাগাবে নাকি, বলছ কি?

ইহার উত্তর কি? গোষ্ঠর অভিধানে অন্তত তা নাই, চোখ দিয়া শুধু জল পড়িল।

মহাজন বলিয়াই চলিল, থাক, এই মাসেই নালিশ করব আমি; যত বেটা বজ্জাতের পাল্লায় প'ড়ে মাটি হলাম আমি। ইঃ এদিকে পরিবারের পরণের কাপড়ের বাহার দেখ না! ঢাকাই, না শান্তিপুরে হে গোষ্ঠ?

পরণের কাপড় জোটে নাই, তাই শ্বশুরের দেওয়া অতি পুরাতন পোষাকী কাপড়খানা দামিনী সে দিন পরিয়াছিল।

দত্তর কথায় ওই ছিন্ন-পাড় জীর্ণ কাপড়খানা অঙ্গে কাঁটার মতই বিঁধিতে লাগিল; লজ্জায় অপমানে বুক ঠেলিয়া কান্না আসিল, আঁচলটা মুখে পুরিয়া ত্বরিত পদে ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল; অবশ হাত হইতে অতর্কিতে টাকা দুইটা মাটিতে পড়িয়া বাজিয়া উঠিল, ঠনঠন।

শব্দ দত্তকে ফিরাইল, সে কোলাহল করিয়া উঠিল, ওই যে, ওই যে টাকা! হুঁ হুঁ বাবা, মহাজনের কথা মিথ্যে হবার কি জো আছে রে বাবা? সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে কেন? আন্ গোষ্ঠ, টাকা আন্।

গোষ্ঠ দামিনীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কথা না কহিতেই, দামিনী টাকা দুইটা মুঠার ভিতর সজোরে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়া জবাব দিল, না, আমি কবরেজকে দোব।

গোষ্ঠর তখন যেন সব সহিত, মানের দায়ে প্রাণ তুচ্ছ হইয়া উঠিয়াছিল। কণ্ঠে তাহার বাক্য সরিতেছিল না, সে অতি রুক্ষস্বরে শুধু কহিল, দাও।

কাকুতি করিয়া দামিনী কহিল, না গো, না, তোমার পায়ে পড়ি।

গোষ্ঠর সেই এক বুলি, দাও। সেই কণ্ঠ, সেই ভঙ্গী, যেন আরও উগ্র।

দামিনী কাঁদিয়া কহিল, ছেলেটার পানে তাকাও।

দত্ত তাগিদ করিল, গোষ্ঠ, আমাকে অনেক জায়গা ঘুরতে হবে।

গোষ্ঠ পাগলের মত কহিল, মরুক ছেলে।

দামিনী টাকা দুইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

শুধু টাকা নয়, মনে হইল ঘর-দ্বার এই দরদহীন বিশ্বসংসারটা পর্যন্ত এমনই করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যদি কোথাও স্থান থাকে সেথা সরিয়া দাঁড়ায়। ছেলেটা কাতরাইয়া উঠিল, মা গো!

দামিনী মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া শান্ত উদাস কণ্ঠে কহিল, আর দেরী নাই, সব ভাল হয়ে যাবে ধন, সব ভাল হয়ে যাবে। তুমিও জুড়োবে, আমিও—

আমিও জুড়োব—এ কথা বুঝি মায়ের মুখে বাহির হয় না, বুকে উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠে, সব ভাসাইয়া দেয়; দামিনী হু-হু করিয়া কাঁদে।

গোষ্ঠ টাকা দুইটা দত্তর পায়ের গোড়ায় ফেলিয়া দিয়া দাওয়ায় উঠিয়া কাঠের উপর বসিয়া রহিল।

দামিনীর কান্নায় তাহারও চোখে জল আসিতে চাহিল; চোখের জল ছোঁয়াচে, একের কান্না অপরের সংযমের বাঁধ টলাইয়া দেয়—প্রায় ভাঙিয়াই দেয়।

মুখখানা বিকৃত করিয়া গোষ্ঠ উদ্যত অশ্রু গোপন করিতে চাহিল। দত্ত টাকা দুইটা বাজাইতে বাজাইতে কহিল, কি পাজী রে তোরা মাইরি, অ্যাঁ! টাকা থাকতে বলিস, নাই, উশুল পড়বে কার বাবা? আমার, না তোর?

*   *   *

কই মোড়ল, ছেলের অসুখ কদিন ?

কবিরাজ অশ্বিনী সিং আসিয়া বাড়ি ঢুকিল, পিছনে পিছনে সুবল, অতি সঙ্কোচে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

পত্নীর বাল্য-সাথীর উপর বিরূপ সংসারে হাজারে ন শো নিরানব্বই জন। মনের গতি মানুষের বাঁকা ; আর প্রীতি ও পিরিতির মাঝে ভেদ করা বড় কঠিন, বিশেষ পুরুষ ও নারীর মাঝে।

গোষ্ঠও সুবলকে সুচক্ষে দেখিত না, বাড়ি আসিলে যেন বিরক্ত হইত, কারণে অকারণে ঝাঁঝিয়া উঠিত।

সুন্দর তরুণ সুবলকে দূরে রাখিয়া নিজের আড়ালে দামিনীর দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিত।

সুবলও তাহা বুঝিত, তাই তার এ সঙ্কোচ।

গোষ্ঠ কহিল, তুমি কেন হে মহান্ত, কি কাজ কি ?

কবিরাজ উত্তর দিল, ওই তো আমায় ডেকে নিয়ে এল।

গোষ্ঠ কহিল, এস কবরেজ, এস, ছেলেটার কদিন থেকে 'উন্দো ধুন্দো' জ্বর, চেতনা নাই ; দেখ ভাই একবার।

ভিতর হইতে দামিনী পাগলের মত কহিল, না না, দেখতে হবে না ; টাকা নাই, টাকা নাই আমার।

গোষ্ঠ মিনতি করিয়া কহিল, দোব দোব টাকা দোব, ভাই কবরেজ ; দুদিন আগে আর পিছু ; দেখ ভাই, দেখ।

কবিরাজ সুবলের পানে চাহিল।

বিবর্ণমুখ সুবল সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল, কিন্তু মনের কথা তো বলা যায় না। দামিনী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে ; গোষ্ঠ কি কথায় কি ধরিয়া বসিবে ! সহসা ঘরের ভিতরে দামিনীর মুখখানা চোখে পড়িল, দামিনীর চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে।

বেদনায় মূকের মুখও ফুটে, ভাষা না হউক, যাতনায় স্বর ধ্বনিয়া উঠে।

সুবলের মুখও ফুটিল, সে মূকের মতই জড়িতকণ্ঠে কহিল, টাকা দেবে কবরেজ মশায়, টাকা দেবে।

কবিরাজ বাজাইয়া লইল, না দিলে—না দিলে আমি তোমার কাছে নোব, তুমি সে দেখে নিও।

সুবল কহিল, তাই দোব, আমিই দোব।

দীনতার মত মনুষ্যত্বনাশী এতবড় ব্যাধি আর দুনিয়ায় নাই, দীনতার চাপে হীনতা আসিবেই।

আজ এই দীনতার চাপে সুবলের অনুগ্রহ গোষ্ঠকে মাথা পাতিয়া লইতে হইল; সে কহিল, তাই দেবে, সুবলই তোমাকে দেবে, আমি সুবলকেই দোব; এই চার-পাঁচ দিনেই দোব।—বলিয়া সে সুবলের মুখপানে চাহিল।

সুবল সান্ত্বনা দিয়া কহিল, না না, তাগিদ নাই আমার, যখন হবে দিও।

কবিরাজ হাসিয়া কহিল, আর না হয় নাই দিলে, মাহান্ত মাহাজন ভাল।

সুবল কোঁচড় হইতে টাকা খুলিয়া কবিরাজকে দিল, কহিল, আর যা লাগবে দোব।

কবিরাজ টাকা ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে কহিল, নগদ বিদায়, তা ভাল। তা মহান্ত, তোমার তেজারতি সেরেস্তায় উশুলের ঘর বুঝি শূন্য?

সুবল লজ্জিত ও ম্লান হাসি হাসিল।

কবিরাজ কহিল, এবার তুমি মানুষ কোরোক কর মহান্ত; না দিলে

মানুষ ধ'রে নিয়ে যাবে, ঘরে খেতে পরতে দেবে, তেজারতি তোমার আরও ফলাও হবে।

আপন রসিকতায় কবিরাজ আপনি হা-হা করিয়া হাসে ; ওদিকে এই তরল কথা গাঢ় কঠিন হইয়া আর একজনের কানে বাজে, ঘরের মাঝে দামিনী হাঁপাইয়া উঠে, তাহার মনে হয়, ওই টাকাটা দেনাও নয়, দানও নয়, ও দাদন—তাহারই উপরে দাদন। কোরোকী পরোয়ানার লেখার রেখা সুবলের বুকের মাঝে আঁকা, যেন সে দেখিতে পায়। সে কণ্ঠস্বর চাপিতে ভুলিয়া গেল। উচ্চ আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না না, না গো, কবরেজ দেখাতে হবে না, ধার করতে হবে না, ছেলে ভাল আছে, ছেলে ভাল আছে আমার।

গোষ্ঠ ধমক দিয়া উঠে, থাম থাম, কত্তাত্তি ফলাতে হবে না, থাম।

মুখ থামিলে রব থামে, কিন্তু রোদন ত থামে না।

দামিনী নীরব হইল, কিন্তু শ্বাসরুদ্ধের মতই পাগল হইয়া উঠিল।

মরণ টুঁটি চাপিয়া ধরে, রোগীর শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে ; সে সমস্ত অঙ্গের শিথিলতল বাঁধনটুকু পর্যন্ত কাটিতে চায়, যেন ওইটুকু টুটিলেই সে আরামের শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। তেমনি অস্থিরতায় দামিনী আপনার সারা অঙ্গের মাঝে যদি কোথাও কোন সোনা-রূপার বাঁধন থাকে, তাহার খোঁজ করিয়া যায়।

নাই, মেলে না ; চোখে পড়ে রোগা ছোলেটার সরু লিকলিকে হাতে শতচ্ছিদ্র জীর্ণ রূপার বালা দুইগাছা।

দামিনী তাই খুলিয়া লয় ; ছুঁড়িয়া সুবলের দিকে ফেলিয়া দেয়। ছেলেটা শ্রান্ত গলায় কাঁদিয়া উঠে, আমার গন্না—আঁ—আঁ।

গোষ্ঠও একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, তাই রাখ ভাই, তাই রাখ ; শুধু হাতে কারবার ভাল নয়, কিছু থাকা ভাল।

ছেলেটার কান্না কিন্তু থামে না, সে কাঁদিয়াই চলে, আমার গন্না—অ্যাঁ—অ্যাঁ।

দামিনী পাষাণের মত বসিয়া রহিল, ছেলেটাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা পর্যন্ত করিল না। করিল না নয়, বোধ হয় পারিল না।

গোষ্ঠ কহে, দুর, শুধুই অ্যাঁ—অ্যাঁ। সে উঠিয়া চলিয়া যায় মাঠের পানে। দাওয়া হইতে নামিয়াই নতদৃষ্টিতে পড়ে ছেলেটার জীর্ণ বালা দুইগাছা, সুবল ফেলিয়া গিয়াছে।

দয়া! সর্বাঙ্গ তাহার রি রি করিয়া উঠে; বালা দুইগাছা হাতে তুলিয়া সে সঙ্কল্প করে, সুবলের মুখে ছুঁড়িয়া মারিয়া আসে। আবার মনে হয়, কত দাম ইহার, বড় জোর বারো গণ্ডা পয়সা; সঙ্গে সঙ্গে আপনি সে হাসে, বড় দুঃখের হাসি। চারিটা টাকা দিয়া বারো আনার দ্রব্য বিনিময়, যদি নাই লয় সে। বালা দুই গাছা সে ছেলেটার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া মাঠের পথ ধরে। ছেলেটা বালা দুইগাছা বুকে চাপিয়া ধরে, মানিকের মত নাড়ে-চাড়ে; ওইটুকু যে এ বিশ্বে উহার আভরণের গৌরব।

সবুজ মাঠে গোষ্ঠের বুকখানা জুড়াইয়া যায়; সে ভাবে, আশা বোধ হয় সবুজ-বরণী!

হালে পোঁতা তরকারী বীজের চারার কাছে বসিয়া আঙ্গুলের ডগা দিয়া সন্তর্পণে মাটি সরায়, একটি প্যাঙাশে নরম অঙ্কুরের প্রত্যাশায়।

—তরুণী নারী যেমন ভাবী সন্তানের স্বপ্ন দেখে!

অঙ্কুর উঠে নাই, মরা মন লইয়া বেচারী উঠিয়া দাঁড়ায়, একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ে; আপন মনেই বলে, মোটে তো আজ তিন দিন, আর

দু-তিন দিনে বেরুতেই হবে। আরও কটা যদি নাই হয়, তাই বা কি, ধানের এবার ছয়লাপ।

আল-পথের পরে দাঁড়াইয়া ধানী জমির পানে তাকায়, চোখ যেন জুড়াইয়া যায়, সে বলে, বলিহারি, কি রং মাইরি, কালো আঁধার, যেন আষিড়ে মেঘ নেমেছে জমিতে।

সে মনের আনন্দে গান ধরে, "ও কালো কালিন্দী-কূলে দেখ সখি কালো মেঘ নেমেছে।"

ওদিকের রাস্তা হইতে কে হাঁকে, গোষ্ঠ! গোষ্ঠ!

ও গাঁয়ের সতীশ সরকার, জেলার সদরে থাকে, পাঁচজনের মামলায় তদ্বির করে; বেঁটে খাটো চেহারা, পেটটা মোটা, কবিরাজ বলে—পাঁচ-সেরী পিলে ওটা। সতীশ তবু ওষুধ খায় না। বলে, কচু জান তুমি, ও আমার বুদ্ধির গেঁড়ো, ওরই জোরে ক'রে খাই বাবা।

লোকে বলে, ও একরকম ভুঁড়ি, বদহজমের ভুড়ি, বেটার টাকা হজম হয় না, তাই ভুঁড়িটা অমনই।

গোষ্ঠ অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া কহে, সরকার মহাশয়, তা সব কুশল তো? সরকার কুশলের ধার দিয়া যায় না, সোজাসুজি কাজের কথা পাড়ে, মামলাকে এত ভয় করলে চলবে কেন গোষ্ঠ?

গোঁফ তাহার ঘন ঘন এপাশে ওপাশে নাচে; ওইটা তাহার মুদ্রা-দোষ। গোষ্ঠ কথাটার মাঝে গুরুত্ব খুঁজিয়া পায় না, সে হাসিয়া কহে, মামলাকে কি আর ডরাই সরকার মশাই, ডরাই যত আমলাকে, খাঁই আর মেটে না।

কথাটা সরকারের গায়ে বাজে, সেও ওই শ্রেণীভুক্ত যে; সে তীব্র কণ্ঠে কহে, শুধু পয়সা কেউ চায় না রে, শুধু পয়সা কেউ চায় না, তারা তো ভিখিরী নয়। এই তো বাবা, নিলে বেটা দত্ত নিলেম ক'রে তোর

জোতকে জোত। সে মামলা করলে, ডিক্রী করলে, নিলাম করলে জানতে পারলি ? আমলারা পয়সা খেয়ে নেমখারামি করে না, যার পয়সা খায়, তার কাজ বজায়, বুঝলি ?

গোষ্ঠর মাথায় যেন কে মুগুরের ঘা মারে, সব যেন গোলমাল হইয়া যায়। তাহার জমি, তাহার অন্নদাত্রী মা ভূমিলক্ষ্মী। তবু সে স্বস্তির আশায় কথাটা অবিশ্বাস করিতে চায়, কহে, আজ্ঞে না, তাই কি হয়, আজই যে দু'টাকা সুদ নিয়ে গেল।

সরকার হাসিয়া ওই সরল বিশ্বাসের জন্য গোষ্টকে গালি দেয়, চাষা কি সাধে বলে রে, বুদ্ধিগুণেই চাষা বলে ; হু, তোমার দোষ কি, বল ? না চাষা সজ্জনায়তে—এ যে শাস্ত্রবাণী। বলি নাই আমি একবার, ওরে গোষ্ঠ, দত্ত নালিশ করেছে, একটা জবাব দে। তুই বললি, টাকা নিয়ে আর জবাব কি দোব সরকার মশাই ? তবে ধ'রে পেড়ে দেখি, দত্তকে এখন থামাই ; তুই ধরলি পাড়লি, দত্তকে মুখে রাজীও করালী, কিন্তু আদালত তো ছাঁটলি না, মামলাটা তুলে নিলে কি না নিলো তা দেখলি না। ভয় হ'ল আমলার হাঁ দেখে। নে, এখন তার ফল দেখ্।

গোষ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া গেল। চোখে তাহার দৃষ্টি জাগ্রত ছিল, কিন্তু দৃশ্য সমস্ত যেন অর্থশূন্য বোধ হয়।

সরকার কহে, তুই নিলেম রদের মামলা কর। দেখ্ বেটা চামারকে কেমন ফাঁসাই, তদ্বিরের ভার আমার, সে তোকে ভাবতে হবে না। ও বেটা বেনে, আমিও কায়েত।

কথা গোষ্ঠর কানে যায়না, তাহার বুকের মাঝে ক্ষোভে দুঃখে ক্রোধে একটা ঘূর্ণী জাগিয়া উঠে।

একটি বিধিবদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচারে নিঃশেষিতপ্রায় মানবাত্মার যেটুকু অবশেষ ওই নিরীহের বুকে ছিল, সে বুঝি বিদ্রোহ করিয়া উঠে ;

বাহিরের দেহেও তাহার বিকাশ হয়, দীর্ঘ মোটা মোটা হাড় বাহির করা দেহখানার শিথিল পেশীগুলার মাঝে একটা চঞ্চল্য বহিয়া যায়, কাঠিন্য ফুটিয়া উঠে, শিরাগুলা মোটা হয়, বোঝা যায়, রক্তের স্রোতে জোর ধরিয়াছে।

মানুষকে সে আর বিশ্বাস করিতে চায় না, তাহার ঘৃণা-ভরা সন্দিগ্ধ চোখে সরকারের মতলব আজ ধরা পড়ে, সে হাসিয়া কয়, মামলার খরচ কে দেবে সরকাব, বুদ্ধি তো তোমার কায়েতের বটে, কিন্তু যাতে রস, ওই জমি আমার লক্ষ্মী মা, ও গেলে খরচ যোগাবে কে? তুমি দেবে?

সরকার কহে, ওরে, কায়েতের বুদ্ধিতে সব আছে, জমিতে তুই দখল দিবি না; জমি তো তোর দখলে, বাঁশগাড়ি করতে যায়, তুলে ফেলে দিবি।

কথাটা ক্রোধতপ্ত কানে লাগে ভাল, গোষ্ঠ কহে, দখল আমি ছাড়ব না সরকার। যা হয় হবে, আমার জমিতে গেলে ওকে আমি গোটা রাখব না। মামলা-ফামালা করতে হয় করুক।

সরকার শিহরিয়া কয়, সর্বনাশ সর্বনাশ, জেল হয়ে যাবে; মামলার বল না নিয়ে কি ফৌজদারী করা হয়; অর্থ না হ'লে শুধু সামর্থ্যে কি হয়?

গোষ্ঠ কহে, তা অর্থ নাই যখন, তখন সামর্থ্য ছাড়া উপায় কি?

সরকার চোখ দুইটি বড় করিয়া কহে, বেটা ডাকাত রে! বলে কি, খবরদার! মরবি মরবি! ওরও লাঠি আছে, ও শালা কি কম ধূত্ত, শালা ধূত্ত শেয়াল, টাকায় জমিদারকে বশ করেছে; দেখেছিস তো জমিদারের চাপরাসীর পেতলে বাঁধা লাঠি?

যুগ-যুগান্তের, পিতৃ-পিতামহের পুষিয়া রাখা জমিদার-ভীতির সংস্কার

বুকের মাঝে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। বুকের ঘূর্ণিটার বল, বেগ ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

এই সেদিনই সে যে কথাটা বলিয়াছিল, সেই কথাটা তাহার মনে পড়ে, বাঘে ধান খায় তো তাড়ায় কে ?

সরকার বলিয়াই যায়, তার চেয়ে শোন্, খরচ বেশি হবে না, পাঁপরের মকদ্দমা ক'রে দোব, হাকিমকে এক দরখাস্ত দোব, হুজুরের অধীন গরিব, মামলা-খরচের সামথ্য নাই—

গোষ্ঠ যেন কূল পায়, সে ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠে, তা হয় সরকার মশায় ? হয়, অ্যাঁ ?

সরকারের গোঁফ-নাচানো মুদ্রাদোষটা প্রবল হইয়া উঠে, সে হাসিয়া কহে, হয়, না হয় সে আমার ভার, তার ভাবনা তোর না ; আসছে সোমবার ক'রে তুই গোটা দশেক টাকা নিয়ে সদরে যাস। আমার বাসা জানিস তো—বাসা ? আচ্ছা না জানিস, নাই, ওই হোটেলে নেমে তুই আগে খেয়ে নিবি, তারপর ওইখানেই থাকবি, আমি খুঁজে নোব, বুঝলি ?

গোষ্ঠ হতাশ হইয়া পড়ে, দশ টাকা যে তাহার পক্ষে দুই শো, দুই হাজার বলিলেও ক্ষতি নাই ; সে ম্লানকণ্ঠে কহে, দশ টাকা যে আমাকে কাটলে বেরুবে না সরকার মশায়, ধারও মিলবে না।

সরকার এবার খিঁচাইয়া উঠে, তবে কি মামলা তোমার অমনই হবে, তোমার চাঁদ-বদন দেখে নাকি ?

ওই যে বললেন, পাঁপরে দরখাস্ত দিলেই হবে ?

খরচ হবে না ব'লে কি একেবারে তিন শূন্যতে চলে বাবা ? দরখাস্ত দিতে খরচ নাই ? এই ধর্ না, হিসেব তোর মুখে মুখেই হবে—উকিল পাঁচ টাকা, মুহুরী সেও পাঁচ সিকের কম ছাড়বে না, কোর্ট-ফী এক

টাকা, ডেমি দু পয়সা, ম্যাদ আট আনা, বিত্তি চার আনা, আর এদিক ওদিক বাজে খরচ সেও তোর দু'টাকার কমে তো হয় না, এই তো তোর দশ টাকা দু'পয়সা, তা ডেমির দু পয়সা তোকে লাগবে না, ডেমি আমি দোব।

গোষ্ঠের চোখ দিয়া জল পড়ে, সে ঘাড় ফিরাইয়া জমিগুলোর পানে চায়, দূর হইতে ঘন সবুজ ধানগুলি সত্য সত্যই কালো মেঘের মত দেখায়।

সরকার কহে, আচ্ছা, এক কাজ কর, তোর ওই নাথারাজ গড়েটা—ওইটে বাঁধা দে, টাকার বন্দোবস্ত আমি ক'রে দোব। যাস সোমবারে, বুঝলি? সবই হবে সেই দিন, বন্ধকী দলিলও হবে, দরখাস্তও দেওয়া হবে, কি বল্?

তখনও গোষ্ঠের চোখ ফেরে নাই, মমতায় সারা বুক টনটন করিয়া উঠে, সে কহে, তাই যাব সরকার মশায়, কিন্তু দেখবেন যেন ফিরতে না হয়; এ বিপদে আপনাকে রাখতেই হবে।

সরকারের পা দুইটা সে চাপিয়া ধরে।

মন বিশ্বাস করিতে চায় না, ভরসা হয় না।

কিন্তু মাটির পরে চাষীর মমতার মোহ করে, তবু যদি।

সরকার ভরসা দিয়া আপন পথ ধরে, গোষ্ঠ ফিরিয়া আপন জমির আড়ুলের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ধানের পাতা নাড়ে চাড়ে, কচি কচি সতেজ ধানগুলি হাওয়ায় লুটোপুটি খেলে, গোষ্ঠর গায়ে পড়ে, পায়ে পড়ে। যেন দুরন্ত চঞ্চল শিশুর দল।

সহসা গোষ্ঠ নারীর মত ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

পথে যোগী মোড়লের বৈঠক; সেথায় গোষ্ঠ আসিয়া বসে।

মাইনার-পাস ছোকরা রমাপতি মাস্টার সেখানে পাঠশালা করে, মোড়ল-কর্তার সাপ্তাহিক খবরের কাগজ পড়ে, আগে নারী-হরণের

কলম—দিবা দ্বিপ্রহরে নারী হরণ, পাশবিক অত্যাচার, বাড়িতে পুরুষ কেহ ছিল না, চারিজন বদমাইশ ঘরে প্রবেশ করিয়া—

মোড়ল কর্তা চেঁচাইয়া উঠে, ওরে মদনা, মদনা, ওরে শালা ডোম!

মদনা বাড়ির রাখাল, সে উত্তর দেয়, কিন্তু মোড়ল কর্তার কানে যায় না।

মদনা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়।

মোড়ল কর্তা খিঁচাইয়া উঠে, বলি, নবাব ছিলেন কোথা, রা দাও না যে?

মদনা বলে, বলি, রা মানুষ কবার কাড়ে, রা তো দিলাম।

আবার মুখের উপর মুখ। কর্তা ঠেঙাগাছটা হাতড়ায়, হাতে ঠেকিতেই সে গাছটা ফাবড়াইয়া দেয়। মদনার লাগে না, তবু সে বলে, মেলে তুমি আমাকে ?

কর্তা কহে, বেশ করেছি। বলিয়া হুঁকা টানে, ক্ষণেক পরে আবার কহে, বুড়ো মানুষের রাগ তো জানিস ; তুই স'রে গেলি না কেন? তা বিকেলে এক সের চাল নিস্, মদ খেলেই গায়ের বেথা সেরে যাবে। যা দেখি, রতে ছুতোরকে ডেকে আন্, বল্, খিল অাঁটতে হবে দুয়োরের। আর হরিশ, বাড়িতে ব'লে দাও চব্বিশ ঘণ্টা দুয়োরের খিল—। শালারা, দিবা দ্বিপ্রহরে, আয় শালারা—

আবার লড়ায়ের সময় মাস্টার লড়ায়ের খবর পড়ে, ম্যাপ অাঁকিয়া, লাইন বুঝায়, বলে, এই দেখ কর্তা, এই হ'ল ফ্রান্স, এই তোমার জার্মানি আর এই রুশ।

বুড়া বলে, এতো শুধু দাগ হে মাস্টার, নক্সা এঁকে লড়াই বোঝা যায়? এখন কে হারল তাই বল, এ সায়েবরা, না উ সায়েবরা ?

মাস্টারের বয়সী বাগাল রায় বলে, বুঝতে কেনে নারবে খুড়ো, এই দেখ, এই হ'ল ফেরান্স।

বুড়া বিরক্ত হইয়া কহে, রাখ্‌ বাপু তোর ফেরাঙ-টেরাঙ, ওসব তোরা বোঝ্‌ গিয়ে। এখন কাপড় সস্তা কখন হবে তাই বল হে মাস্টার?

মাস্টার বলে, যে ডুবো জাহাজের ঠেলা কত্তা, মাল নিয়ে ভাসা-জাহাজের কি পার আছে? মাল নিয়ে জলে ভেসেছেন কি দুই তিন কোশ দূর থেকে তাল মেরে, চোল—চোল—মারা ঢুঁ, আর এক ঢুঁতেই বাস্‌ চিচিং ফাঁক, জলের তলায় ভরভর—ভস।

বাগাল বলে, তবে ডুবো-জাহাজের টিরিক-ফিরিক ম'ল এইবার, আকাশে ফরফর উড়বে আর কলকাতায় এসে নামবে তোমার; কাটুক শালা ডুবো-জাহাজ জলের তলে বুটবুটি।

বিস্ময়ে বুড়ার চোখ দুইটা ভাটার মত পাকাইয়া উঠে, সে কহে, উড়বে কি ক'রে বাপু; গরুড়পাখীর বাচ্ছা ধরেছে না কি অ্যাঁ?

মাস্টার হাসিয়া বলে, না কত্তা, কল, কল, কলে উড়বে—অ্যারোপ্ল্যান।

কাগজে এরোপ্লেনের ছবি আঁকে, ছবিটা দাগে দাগে হয় একটা বৃত্ত।

বুড়ো বলে, দূর, এ কি হ'ল, রসগোল্লা আবার ওড়ে?

মাস্টার বললে, কেন কত্তা রাহুর ছবি, চাঁদের চেহারা দেখ নি? ও সব থেকেই ওরা এই সব করলে; সব আমাদের নিয়ে, আমাদের পুষ্পক রথ—

বুড়া চটিয়া কহে, সবই তো শুনি তোদের, ও ছিল-ফিল বুঝি না, করতে পারিস তো বুঝি, পারিস বানাতে ওই কি বলছিস এলাংপেলাং না কি?

বর্তমানের নগ্ন রিক্ততায়, দারিদ্র্যে, মরণ-দ্বারের বৃদ্ধের পর্যন্ত অতীতের পানে চাহিবার অবকাশ নাই।

তরুণ চাহে ভবিষ্যতের পানে, সে স্বপ্ন হয়তো।

বাগাল কহে, হবে বইকি খুড়ো, আমাদেরও হবে।

সে সব পুরানো কথা।

আজ মাস্টার পড়িতেছিল, অসহযোগ আন্দোলন, বক্তৃতার সুরে সে পড়িতেছিল, মহাত্মার বাণী, স্বরাজ আসিবে, স্বরাজে আমাদের জন্মগত অধিকার, শুধু বাণী পালন কর। বুঝবে কত্তা, স্বরাজ হলেই আর চাই কি!

স্বরাজ মানেটা আমায় বুঝিয়ে দিতে পার, তবে তো বুঝি ব্যাপারটা কি?

মানে বুঝলে না কত্তা? আমরাই আমাদের মালিক—রাজা, ওই ওতেই আমাদের দুঃখ ঘুচবে কত্তা।

তাই কি হয় মাস্টার? রাজা থাকবে না—

বহুযুগ নিরক্ষরের কানে কথাটা বিস্ময়ের মত ঠেকে।

তরুণ রক্ত, যুগের হাওয়ায় উষ্ণ চঞ্চল, বাগাল কহে, কেন হবে না খুড়ো, এই তো ফেরান্স, অ্যামেরিকা—

কর্তা চটিয়া যায়, তুই থাম বাপু, আর পাকামি করিস না, মাস্টার বলছে তাই বলুক, না খালি ফেরান্, ফেরান্! হ'লি কি রে বাপু, বাপ-খুড়োর খাতিরও করবি না?

ও পাড়ার গণেশ দেবাংশী কহে, যা বলেছ ভাই, আমাদের আমল পালটিয়ে গেল, সে সব আর কিছু রইল না।

মাস্টার বলে, তফাত তো হবেই কত্তা, তোমরা হ'লে পুরনো, আমরা নতুন।

গোষ্ঠর দুঃখার্ত মন দুঃখদূরের কথাটা ভোলে না. সে কহে, জমিদার-মহাজন উঠবে বলতে পার?
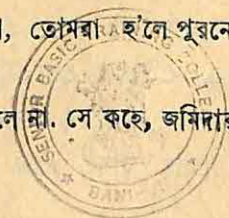
অন্তর-ফাটা বাণী, আন্তরিকতার গাম্ভীর্য এত গভীর যে, মজলিসের চটুল ভাবটুকু উবিয়া গেল। মরুর বুক-চেরা ঝঞ্ঝা বায়ুস্তরের রস পর্যন্ত যেমন শুষিয়া লয়।

সবার বুক চিরিয়াই দীর্ঘশ্বাস বহে।

যোগী বলে, ওই যা বলেছ গোষ্ঠ, স্বরাজ-ফরাজ বুঝি না আমরা, যমের হাত হতে বাঁচি কিসে তাই মহাত্মা বলুক। হ্যাঁ, চাচা আপন জান বাঁচা।

অতকালের অত্যাচারে, অনাহারে অতীতের সব—দেশ, ধর্ম, সমাজ সমস্ত ইহাদের কাছে বুঝি তুচ্ছ হইয়া উঠিতেছে। শুধু জীব-জগতের একমাত্র জন্মগত প্রেরণা, বাঁচিবার চেষ্টায় কঙ্কালগুলা পাগল।

কিন্তু ক্লান্ত মস্তিষ্কে উপায় আসে না ; শ্রান্ত দেহ এলাইয়া পড়ে।

কে যে ইহাদের জীবন অদৃশ্যভাবে যুগযুগান্তর ধরিয়া শোষণ করিয়া লইতেছে, তাহাও ইহারা জানে না ; বিধাতা, না মানুষ ?

আর সে জীবন ফিরিয়া চাহিতে চীৎকার করিতেও বুঝি ক্লান্তি আসে। তবে তাহা চায় তাহারা ; মাটির তলের অঙ্কুর যে সুরে যে ভাষায় আলো বাতাস চায়, সেই সুরে সেই ভাষায় ইহাদের সে চাওয়ার বাণী বুকের মাঝে অহরহ বাজে।

কয় দিন পর।

গোষ্ঠ মাঠ হইতে ফিরিয়া বাড়ির ভেজানো দুয়ারটা খুলিতেই মনে হইল, ওদিকের দুয়ার দিয়া কে বাহির হইয়া গেল, আবছা দেখা, ঠিক চেনা গেল না, কিন্তু মনে হইল, সুবল।

গোষ্ঠ ত্বরিত পদে অনুসরণ করিয়া খিড়কির দুয়ারে আসিয়া

কাহাকেও দেখিতে পাইল না ; ঠিক পাশেই সুবলের দুয়ার বন্ধ, শিকলটি পর্যন্ত নড়ে না। গোষ্ঠ বাড়ি ফিরিয়া হাঁকিল, ওগো!

কেহ সাড়া দিল না।

ভিতর-ঘরের দরজা খুলিয়া দেখিল, রুগ্ন ছেলেটা অকাতরে ঘুমাইতেছে, দামিনী নাই। দাওয়ার পরে কোদালিটা রাখিয়া হুঁকা হাতে চলিল মোড়ল কর্তার দলিজার পানে ; কিন্তু মনের কোণে একটা অস্বস্তি জাগিয়া রহিল, কে গেল ?

দামিনী জল আনিতে গিয়াছিল।

ঘড়া কাঁখে বাড়ি ফিরিয়া দুয়ারের পাশে কোদালি দেখিয়া বুঝিল, গোষ্ঠ মাঠ হইতে ফিরিয়াছে। কিন্তু গেল কোথায় ? হয়তো নেশার আড্ডায় গিয়াছে।

মনটা কেমন হইয়া উঠিল।

এমন করিয়াই কি মানুষ নেশায় মজে ? ঘরে রোগা ছেলে, তার খোঁজ লওয়া নাই, মুখে কিছু দেওয়া নাই, আর এ কদিন আবার সবই বেশি বেশি! আর মাঠেই বা এত কাজ কি ? নিড়েন তো হইয়া গেল!

বিরক্তিভরে দামিনী ঘড়াটা রাখিয়া আপন মনেই বকিতে বকিতে কোদালিখানা ঘরে ঢুকাইতে সেখানা তুলিয়া সোজা হইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িল সম্মুখের কুলুঙ্গির 'পরে।

রঙিন কাগজে মোড়া কি ওইটা ?

দামিনী কোদালী ছাড়িয়া মোড়ক খুলিয়া দেখে—একজোড়া শাঁখা।

লাল রঙের উপর সূক্ষ্ম তুলির রেখার হলুদ রঙের নক্সা, দামিনীর চোখ ফিরিল না। রূপার পৈঁছার চেয়ে শাঁখার রূপখানি যেন শতগুণে অপরূপ। এ তো শাঁখের শাঁখা নয়, এ তাহার সোনার কাঁকন।

শাঁখা জোড়াটির রক্ত-রাগটুকু মুহূর্তে অনুরাগ হইয়া তাহার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

আশ্চর্য মানুষের মন, আবার দুই ফোঁটা জলও চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল ; অধরে অতি মৃদু ম্লান হাসি।

ওই নিরুপায় মানুষটির অক্ষমতার বেদনা শতগুণ হইয়া মনে বাজিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি সাতু ঠাকুরঝির বাড়ি শাঁখা পরিতে ছুটিল।

ঠাকুরঝি, শাঁখা জোড়াটি পরিয়ে দাও ভাই।—বলিয়া কাপড়ের পাড় জড়ানো হাত দুইখানি নিঃসঙ্কোচে বাহির করিয়া দিল।

সাতু কহিল, পৈঁছে কি হ'ল লো, হাতে পাড় জড়ানো ?

দীর্ঘ অনশনের পর অর্ধাশনের তৃপ্তিতেই মানুষ ক্ষুধার দুঃখ ভোলে ; শাঁখা দিয়াছে—এই সুখে, পৈঁছা গিয়াছে—এ দুঃখ দামিনীর মনে ঠাঁই পাইল না ; সে অম্লান বদনে মিথ্যা বলিয়া গেল, খিল ছেড়েছে, তাই খুলেছি।

সতু মুখ টিপিয়া কহিল, যাই বলিস ভাই বউ, গোষ্ঠদাদা বড় মেগো।

কেন লা ?

এই দেখ্ না পৈঁছে খুলতে না খুলতে রাঙা শাঁখা, বোন হ'লে পাঁচ দিন লাগত। এই বলিয়া সাতু ছড়া কাটিয়া উঠিল—

"রাঙা হাতে রাঙা শাঁখা দেখতে ভালবাসি হে।"

দামিনী আনন্দ-কৌতুকে কোপ করিয়া উঠিল, মর্, মর্, ভাই স'গী।

সাতু আবার ছড়া কাটিয়া লইল—

"ভাইয়ের সোহাগ্ বউ নিয়েছে, বোন হয়েছে সুখের কাঁটা।
বউয়ের বেলা শাঁখা শাড়ি, বোনের পিঠে মুড়ো ঝাঁটা।"

মর্, এতও জানিস।

না জানলে বউ জব্দ হয় কি ক'রে? কই, হাত দে দেখি, বেলা থাকতে পরিয়ে দেই; ল্যাম্পের আলোতে রাঙা হাতের শোভা দেখে দাদার আশ মিটবে কেন?

দামিনী হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিল, ভারী দুষ্টু হয়েছিস, দাঁড়া এবার নন্দাই আসুক, ব'লে দোব।

সাতু শাখা পরাইতে পরাইতে কহিল, কি বলবি?

বলব,—উঃ, আস্তে আস্তে লো,—ব'লে দোব, সাবধান হ'য়ো ভাই, তোমার গিন্নীর ভারী নজর ভাইয়ের ওপর। দেখবি, আর পাঠাবে না। উঃ উঃ, না না, আর বলব না, উঃ।

কথার মাঝেই সাতু বলিতেছিল, বলবি, বলবি আর, বল, নইলে আরও জোরে—এ—এই হয়েছে, নে চোখ মোছ।

শাঁখার চাপে দামিনীর চোখে জল আসিয়াছিল।

সাতু কহিল, মাইরি বউ, তোকে যা লাগছে ভাই, কি বলব! মুখখানা সিঁদুর-মাখা, চোখের পাতা ভারী! যা যা, ছুটে যা, এই রূপ নিয়ে দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়া; আর শাঁখা-পরা রাঙা হাত ছুতোনাতা ক'রে মুখের কাছে নেড়ে দিগে। উঃ!

দামিনী সাতুর পিঠে একটা কিল বসাইয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

সাতু কহিল, বটে, এই বুঝি শাঁখা পরানোর বানি?

গোষ্ঠ দাওয়ায় বসিয়া ধার-করা তামাকটুকু টানিতেছিল আর ভাবিতেছিল, লোকটা কে? সুবল? কিন্তু সুবলের দুয়ার তো বন্ধ, শিকল পর্যন্ত নড়ে না। সে হইলে দুয়ার বন্ধ করার শব্দ তো হইত, অন্ততঃ শিকলটাও নড়িত! তবে কে?

দামিনী সাতুর বাড়ি হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়াই গোষ্ঠকে

দেখিয়া সানন্দ কৌতুকে থমকিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া কহিল, দুৎ, সাড়া দেয় না, এমন লোক!

গোষ্ঠ উঠিয়া দুয়ারে উঁকি মারিয়া দেখে, দামিনীর পিছনে কে।

দামিনী কিন্তু ওদিকে খেয়াল করে না। মনে তাহার তখন রসের মাতামাতি।

রূপের উপচারে দেবতাকে অঞ্জলি দিতে সাধ হয়, শাঁখা-পরা হাত দুইখানি মেলিয়া দিয়া কহিল, দেখ দেখি, কেমন হয়েছে।

বীণার আ-বাঁধা তার ঘা খাইলে বেসুরা ঝঙ্কারই তুলিয়া থাকে, গোষ্ঠর সন্ধান-ব্যগ্র সন্দিগ্ধ মন শাঁখা দেখিয়া শোভায় মুগ্ধ হইল না, বাঁকা চোখে তীব্র দৃষ্টিতেই চাহিল। পাইল কোথায়? সম্বল তো সবই জানা। চট করিয়া মনে পড়িল, আবছা দেখা লোকটাকে সুবল বলিয়াই মনে হইয়াছিল; তবে শাঁখার গায়ে এখনও অস্পষ্ট হাতের ছাপ—ও সুবলের ছাপ বলিয়াই গোষ্ঠর প্রত্যয় জন্মিয়া গেল।

সে দামিনীর হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

দামিনীর লাজ-রক্তিম আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি মুহূর্তে শবের মত বিবর্ণ হইয়া গেল।

ভিতরে রুগ্ন ছেলেটা একটা গভীর যন্ত্রণাকাতর শব্দ করিয়া উঠিল, উঃ, মা গো।

দামিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘরের দিকে চলিল।

উদ্ভ্রান্ত পদক্ষেপে চলিতে দুয়ারের চৌকাঠে হুঁচোট খাইল, কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না; সে আর্তকণ্ঠে কহিল, কি হ'ল কি হ'ল ধন, আজ যে ভাল ছিলে বাবা।

ছেলেটা ওই যে 'মা গো' বলিয়া ডাকিল, ওই শেষ ডাক, তারপর আর ডাকিল না।

এমন একটা প্রবল জ্বর আসিল যে, কঙ্কালসার দেহখানা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, নাভি হইতে বুক পর্যন্ত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া উঠে; শীর্ণ হাতখানায় বুঝি অবশিষ্ট সব শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেহের সকল আবরণ ঘুচাইতে চাহিল; যেন ওই তূলার আবরণ পাষাণের ভারে বুকে চাপিয়া বসিয়াছে।

বসিয়াছিল সে মরণ।

তিলে তিলে বিন্দুর পর বিন্দু ভার বাড়াইয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় দেহখানার সকল স্পন্দন নীরব করিয়া দিল।

দামিনী বুক চাপড়াইয়া মেঝের 'পরে আছাড় খাইয়া পড়িল; আর্ত মাতৃকণ্ঠে মরণের বিজয়বার্তা ঘোষিত হইয়া গেল; নিশীথে নিস্তব্ধ পল্লীটার আকাশ বাতাস শিহরিয়া উঠিল।

গোষ্ঠ উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, রাক্ষুসী, সর্বনাশী, তুই আমার ছেলে খেলি; তোর পাপেই আমার ছেলে গেল। সর্বনাশী, ছেলের চেয়ে তোর সুবল বড় হ'ল, একজোড়া শাঁখা বেশি হ'ল?

ওই একটা কথায় নারীর সন্তানের শোক পর্যন্ত মূক হইয়া গেল, কে যেন বুকের 'পরে পাহাড় চাপাইয়া দিল।

অসাড় নিস্পন্দ পাষাণপিষ্টের মত যেখানে পড়িয়া ছিল, সেইখানেই সে পড়িয়া রহিল, মৃত সন্তানকে বুকে টানিয়া লইতে পর্যন্ত পারিল না!

রাঙা শাঁখা জোড়াটা অন্ধকারের মাঝেও আগুনের মত জ্বলিতেছিল, না, দামিনীর মনের মাঝে জ্বলিতেছিল, কে জানে! সহসা শাঁখা জোড়াটা আপন কপালে সজোরে ঠুকিয়া সে ভাঙ্গিয়া দিল।

তারপর আবার অসাড় নিস্পন্দ।

শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস-মাখানো একটি মৃদু কথা বুঝি জোর করিয়াই বাহিরে আসিতেছিল, মা, উঃ মাঃ!

বাহিরে ঝরিতেছিল জল। বর্ষণমুখর শ্রাবণ রজনীর ওই মৃদু কণ্ঠ ঘরের দাওয়ায় গোষ্ঠের কান পর্যন্তই পৌঁছিতেছিল না, তা পাড়া-প্রতিবেশীর নিদ্রাভঙ্গ হয় কি করিয়া।

আসিল শুধু সাতু। দামিনীর প্রথম বুকভাঙ্গা আর্তস্বর তাহার কানে গিয়াছিল; সে যখন আসিল তখন দামিনীর কান্না থামিয়া গিয়াছে, সে পাথরের মত পড়িয়া আছে।

আরও একজন আসিল, সে সুবল।

সে সাতুরও আগে আসিয়াছিল, কিন্তু প্রবেশমুখেই উন্মত্ত গোষ্ঠর কথা কয়টা শুনিয়া আর ঘরে ঢুকিতে সাহস করে নাই, ঘরের পিছনে ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়াছিল।

সাতু কহিল, বউ, একটু কাঁদ্ কেন ভাই।

দামিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, না ঠাকুরঝি, আমিই খোকাকে মেরে ফেলেছি।—বলিয়াই হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, নীরব রোদন, অশ্রুরই ধারা শুধু।

সাতু সান্ত্বনা দিল না, দিবার প্রয়াসও করিল না।

কতক্ষণ পরে আবার দামিনী কহিল, ঠাকুরঝি, জল হচ্ছে বুঝি?

সাতু কহিল, আড়া-বৃষ্টি জল, মাঠ ঘাট ভেসে গেল। পুকুর গড়ে সব ভ'রে উঠেছে।

দামিনী ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, আমাদের গড়েও তবে ভরেছে?

শঙ্কিত কণ্ঠে সাতু তিরস্কার করিল, পোড়ারমুখী, দাদার হাতে শেষে কি দড়ি পরাবি নাকি? ছি!

তারপর সব চুপ, কথা যেন সব হারাইয়া গেল।

শুধু কয়টি প্রাণীর দুঃখদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস, সে যেন শ্মশানের বুকে কঙ্কালের মালার মাঝ দিয়া বায়ুপ্রবাহ।

জীর্ণ কাঁথার' পরে ছেলেটার শব।

শ্মশানখানা যেন ঘরের বুকেই প্রকট হইয়া উঠিল।

জীবন তাহা সহিতে পারে না, দূরে সরাইয়া দিতেই হইবে।

আগে কহিল সাতু, দাদা, ছেলেটার তো একটা গতি করতে হবে।

গোষ্ঠ কহে, হ্যাঁ, কিন্তু যে জল—

দামিনী কথা কহে না, মা—হয়তো সন্তানের শব সবার শেষ পর্যন্ত বুকে ধরিয়া রাখিতে চাহিবে, কিন্তু অবশেষে তাহাকেও তাহা ত্যাগ করিতে হইবেই।

জীবন মরণের ভয়েই অস্থির, তাহার সান্নিধ্য সহিবে কেমন করিয়া?

সাতু কহে, পাড়ায় ডাক।

বর্ষণের পানে আঙ্গুল দেখাইয়া গোষ্ঠ বলে, বাইরেও কি হচ্ছে দেখছিস?

তা ব'লে তো বাসী ক'রে ফেলে রাখে না। দাঁড়াও, আমি ডাকি।

সাতু উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল, মহান্ত!

দামিনী ধীরে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, না।

গোষ্ঠ কহিল, দাঁড়া, আমি পাড়ায় ডাকি।

সাতু কহিল, ডাকলেই আসবে?

দামিনী কহিল, আর কেউ আসবে না।

সাতু কহিল, এলে ওই আসবে ; এ জলে আর কেউ আসবে না।

ততক্ষণে লোকটি আসিয়া পড়িয়াছে; ভিজিতে ভিজিতে সুবল আসিয়া কহিল, আমাকে ডাকছিলে?

ছেলেটা নষ্ট হয়েছে, তার গতিটা ক'রে দাও ভাই।

আর কে যাবে?

দাদাই যাবে, আর কে যাবে বল? এস, নাও, তুলে নাও, আর দেরি ক'রো না।

সুবল বিব্রত হইয়া কহিল, তুমি এনে দাও মায়ের কোল থেকে।

সাতু কহিল, এস তুমি। বউ মড়ার মত প'ড়ে আছে এক পাশে!

সুবল ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সত্য সত্যই দামিনী মড়ার মত পড়িয়া।

তাহার চোখে জল আসিল; তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বিছানা সুদ্ধ ছেলেটিকে তুলিতেই চোখে পড়িল কয়টা শাঁখাভাঙা টুকরা, রাঙা টকটকে, আগুনের মত ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে যেন।

ধকধকে টুকরা কয়টা অঙ্গারের মত দাহে বিছানাটা ভেদ করিয়া তাহার অঙ্গ যেন পোড়াইয়া দিল।

ইচ্ছা করিল, ওই মরা ছেলেটাকে দামিনীর বুকে আছড়াইয়া ফেলিয়া দেয়, বলে, উপেক্ষার বিনিময়ে কি উপকার পাওয়া যায়?

সাতু পিছন হইতে বলে, নিয়ে যাও মহান্ত, নিয়ে যাও, মা কি ওই দেখতে পারে! বউ কেমন করছে।

সুবলের আর চিন্তার অবসর থাকে না, অন্ধকার বর্ষণমুখর শাঙন-রাত্রির সেই তাণ্ডবের মাঝে শব বুকে সে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সাতু কহিল, দাদা।

গোষ্ঠ সুবলের পিছন ধরিয়া কহিল, চল মহান্ত।

সাতু দামিনীকে ঠেলা দিয়া কহিল, বউ, বউ, বউ!

উত্তর নাই।

মুখে চোখে জলের ছাঁট দিতে দিতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সাতু কহিল, জাগিস নে হতভাগী, আর জাগিস নে।

ভাগ্য নিষ্ঠুর, দামিনীর জুড়ানো হয় না; সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জাগে।

গোষ্ঠ ও সুবল রাস্তায় জল ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে শ্মশানের দিকে চলিয়াছিল।

মাথার উপর অবিরাম বর্ষণ আর দুরন্ত বাতাস; হাড়ের ভিতর অবধি কনকন করিতেছিল।

খান বিশেক মাঠ পার হইয়াই আর পথ নাই, মাঠ নাই, জল—শুধু জল, আর জলপ্রবাহে র একটা কল-কল্লোল।

পায়ে কাঠকুঠার মত কি সব ঠেকিতেছিল, বিদ্যুৎচমকে সেগুলো চেনা যায়—পোড়া কাঠ, আঙার রাশি, ওই যে একটা কঙ্কালও।

গোষ্ঠ কহিল, শ্মশানে এসেছি না কি মহান্ত?

না, বানের ঠেলে শ্মশানটা এগিয়ে এসেছে। কথাটা শেষ হয় না, ওইটুকু বলিয়া বক্তাও শিহরে, শ্রোতাও শিহরে।

সুবল আবার বলে, তা—হ'লে—

স্বর বুঝিয়া গোষ্ঠ উত্তর দিল, হ্যাঁ দাও তা হ'লে এইখানেই—

সুবল নামিয়া গিয়া বন্যার প্রবাহের মুখে শবটা ছাড়িয়া দেয়।

গোষ্ঠ গম্ভীর কণ্ঠে কহে, যা, চ'লে যা, তুইতো জুড়লি। আমার বুকে জ্বলে চিতে জ্বলুক।

ভাবুক বাউল উদাস সুরে গান ধরিল, "শ্মশান ভালবাসিস ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি।"

গোষ্ঠ ধীরে প্রশান্ত কণ্ঠে কহে, শ্মশান তো বুকে বুকে, ঘরে ঘরে, কিন্তু মা আসে কই, নাচে কই মহান্ত? ফাঁকি, ও সব ফাঁকি, ও সব মানুষের মন-গড়া কথা।

দুঃখের দিনে চরম নগ্ন বাস্তবতার মাঝে, মানুষের আশা-প্রত্যাশা আকাঙ্ক্ষা, সর্বরিক্ত মন, পরম প্রত্যক্ষ সত্যের সন্ধান চায়।

যুগে যুগে পিষ্ট দারিদ্র্য দেবতার সন্ধান পায় না, সে কয় সব ফাঁকি, মানুষের রচা কথা ওসব।

গোষ্ঠ আবার বলে, এ এইবার সবাই বুঝেছে, সবাই বলবে, দেখো।

ওই উপলব্ধি হয়তো সত্যি ; ওই বাণী বলিবার জন্যই যেন বিশ্ব-মানবের অন্তর প্রলুব্ধ হইয়া উঠিতেছে।

মানুষ জন্মায় ক্ষুধা লইয়া, সে ক্ষুধা তাহার মরণ অবধি মেটে না ; মরণেও তাহার লয় নাই ; মানুষ মরে, অতৃপ্ত ক্ষুধা তাহার ধরণীর বুকে হা-হা করিয়া বেড়ায়, তাহার পর পুরুষের বুকে আশ্রয় লয়। এমনই করিয়া মানুষের ক্ষুধার আজ অন্ত নাই। দিনে দিনে সে অসহ লোলুপ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে।

আদি যুগে উদরের ক্ষুধায় মানুষে মানুষের মাংস খাইয়াছে, আজ ভোগের অতৃপ্ত ক্ষুধায় একটি জাতি অপর জাতির বুকের রক্ত অদৃশ্য শোষণে হরণ করে, আজ একটা মানুষেরই ক্ষুধা বোধ করি সমগ্র দুনিয়া গ্রাস করিয়াও মেটে না। ক্ষুধার তাড়নায় একের অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ নাই ; মানুষের ক্ষুধার তাড়নায় যীশুর সাধনা আজ ধর্মযাজকের কোমরে বাঁধা লোহার ক্রুসে নিস্পন্দ, ব্যর্থ বুদ্ধের বাণী আজ পাষাণের গায়ে আখরের রেখায় মূক।

দিন দুই পর, তখনও গোষ্ঠর চোখের কোল হইতে অশ্রুর রেখা মুছে নাই, তাহার দুয়ারের সম্মুখ দিয়ে ঢোল পিটিয়া দত্ত গোষ্ঠর জমি দখল করিতে চলিল।

অপরিসীম শোকের রুক্ষতায় বুকটা হু-হু করিতেছিল।

তাহার উপর বঞ্চনার, প্রতারণার ক্ষোভে সেথা জাগিয়া উঠে বিপুল ক্রোধ, সে যেন একটা ঘূর্ণি।

আগুনের শিখা যেন পাক খাইয়া মাথার দিকে ছুটে, জ্ঞান-বিবেচনার অবসর থাকে না। গা-ঝাড়া দিয়া গোষ্ঠ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে, ত্রস্ত পদক্ষেপে এদিক ওদিক কি সন্ধান করিয়া ফেরে। চায় সে লাঠি, মেলে না।

সে ছুটিয়া গিয়া উঠে ঠিক পাশের গাঁয়ের ভল্লাপাড়ায় রাম ভল্লার বাড়ি।

রাম লাঠি-খেলার ওস্তাদ; সে জেল-খাটা দাগী, ভাল লোকে বলে, সে ডাকাত।

রাম বলে, বলুক, ভদ্দরলোককে না মানলেই সে ডাকাত। তা ডাকাত আমি।

ঝড়ের মত গোষ্ঠ আসিয়া কহে, ওস্তাদ একগাছা লাঠি—

কথা শেষ করিতে পারে না, বুকের মোটা মোটা পাঁজরগুলা লাফাইতে থাকে।

পাঁচ হাত লম্বা মানুষটি, দেহে ভোগালো মাংস নাই, সব যেন হাড়, কিন্তু সেগুলো বাঁশের মত মোটা, বোধ করি লোহার মত শক্ত।

রাম বসিয়া তামাক খাইতেছিল।

সে জিজ্ঞাসাও করে না, কেন, কি বৃত্তান্ত। নির্বিকারভাবে আঙুল দেখাইয়া বলে, ওই মাচায় দেখ।

গোষ্ঠ মাচায় উঠিয়া লাঠি লইতে লইতে কহে, শালা দত্ত ফাঁকি দিয়ে ডিগ্রী ক'রে আমার জমি দখল করছে ওস্তাদ।

রাম সেইরূপই নির্বিকারভাবে বলে, দুনিয়াসুদ্ধু ওই হাল গোষ্ঠ, সব যে যার পারে কেড়ে নেয়; সব ওই। একা আর ওর দোষ কি, আর দোষই বা কার; তুই আমি সবাই তো ওই চাই, তবে নিই না পয়সা নাই বলে, পারি না ব'লে।

সত্যই বুঝি ইহার জন্য মানুষকে দায়ী করা যায় না।

এ বুভুক্ষা যে তাহার সহজাত, এ ক্ষুধা তাহার জীবনের ধর্ম। তবে দায়ী কে?

রাম বলে, আমি দোষ দিই ভগবানের, চন্দ্রসূয্যির মত বড় বড় চোখ নিয়ে সে দেখছে কি? তার রাজ্যিতে এমন হয় কেন?

সত্য কথা, ইহার জন্য দায়ী জীব-জগতের জীব-ধর্মের স্রষ্টা যদি কেহ থাকে, সে। শিল্পের খুঁতের জন্য শিল্পী দায়ী, শিল্প নয়। সে শুধু অঙ্গহীন।

রামের মেয়ে হিমি গোষ্ঠর সমবয়সী, সে পাশের বাড়ি হইতে আসিয়া পিছন হইতে কহে, লাঠি হাতে যে? লাঠি কি করবে মোড়লদা?

তিক্তস্বরে রাম কহে, তোর মাথায় মারবে, লাঠি নিয়ে বেটাছেলে কি করবে!

কৌতুকে খিলখিল শব্দে হাসির কলরোল হিমির কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্তেই সে হাসি নীরব হইয়া গেল, যেন ঝরণা ঝরিতে ঝরিতে শুকাইয়া গেল।

গোষ্ঠ হিমির পানে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার সে রুক্ষ মুখ, চোখের কোলের ওই কালো রেখা দেখিয়া হিমির ঝরণা শুকাইয়া গেল; সে শিহরিয়া কহিল, ও কি মোড়ল-ভাই, এ কি চেহারা?

গোষ্ঠ লাঠিগাছাটি মাটিতে ঠুকিয়া দৃঢ়তা পরীক্ষা করিতে করিতে কহিল, ছেলেটা পরশু রেতে গেল।

হিমি অর্তস্বরে কহিল, অ্যাঁ! খোকা!

রাম ধমক দিয়া কহিল, হিমি, প্যানপ্যান এখন নয়, পরে করবি; মরদ লাঠি হাতে করলে কাঁদতে নাই। যা গোষ্ঠ, বেরিয়ে পড়, দেখ সঙ্গে যাব?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গোষ্ঠ কহিল, ওস্তাদ, বড় ভাল হয়।

আর একগাছা লাঠি টানিয়া লইয়া রাম দাঁড়াইয়া কহিল, চল্।

রসিক দত্ত বাঁশের লগির মাথায় লাল পতাকা বাঁধিয়া গোষ্ঠর জমিতে পুঁতিয়া দখল লইতেছিল, বাঁশগাড়ি করিতেছিল। সঙ্গে জমিদারের নগদী, আদালতের পেয়াদা, নিজের রাখাল আর ঢুলি।

দত্ত মনে করে, এই বাহিনীই তাহার বিশ্ব বিজয় করিবে, সে বলেও, জোর কি আমার রে, জোর আদালতের।

খাতকে কিছু বলে না, কিন্তু ছেলের দল ছাড়ে না, উত্তর দেয়, আর আদালত টাকার, তবে আর দত্তকে ঠেকায় কে?

শুধু টাকায় হয় না ধন, মামলায় মাথা চাই! সঙ্গে সঙ্গে তাহার বকের মত লম্বা গলার 'পরে ছোট্ট টেকো মাথাটি টিকটিকির মত নড়ে।

তা তোমার খুব আছে, বেরালের মত চোরা বুদ্ধি তোমার খুব; কাঁকুড়চুরি করা ক'রে চাকলার জমিটা নিলে বাবা। ম'রে যে কি হবে তুমি—

আর একজন বলে, বেনে ম'রে জোনাক পোকা, করে টিপির টিপ!

কেউ বলে, যখ, যখ হয়ে মাটির তলায় ব'সে টাকা গুনবে।

কেউ বলে, বাদুড়, বাদুড়, উল্টোমুখ ক'রে গাছে ঝুলবে।

কেউ বলে, সে তো ফিরে জন্মালে; যমপুরীর কথা বলে, সেই গরম তেলে, ছ্যাঁক কল্‌কল। তবে তো চামড়া উঠবে।

দত্তের ভয় এইখানে—গরম তেলের নামে লম্বা লিকলিকে শরীরখানা আহত সরীসৃপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠে, গায়ে কাঁটা দেয়, সে তাড়াতাড়ি বলে, ও হাসি-তামাসা নয় বাবা, হাসি তামাসা নয়; ছাড়ান দাও, ছাড়ান দাও।

কেউ বলে, নয়ই তো, এ তো শাস্ত্রের কথা, খোদ বেদব্যাস।

দত্ত তাড়াতাড়ি পথ ধরিয়া কহে, যাস্ যাস্, তামাক খাওয়াব, ভাল তামাক খাওয়াব—কাষ্ঠগড়ার, আট আনা সের, আট আনা সের।

একটা ছেলে পেছন হইতে এক আঁজলা জল দত্তর গায়ে ছিটাইয়া দিয়া কহে, ছ্যাক কলকল।

দত্ত আতঙ্কে লাফাইয়া উঠে, ইরেঃ,বাবাঃ !

দত্তর মন দমে কিন্তু ক্ষুধা কমে না, সে বাড়িয়াই চলে।

আদালতের পেয়াদা কহে, কই দত্ত, নিশেন দেবে কে ?

খোদ জমিদার নগদী। কই রে, কত দূর আর ?

নগদী কহে, হুই—ওঃ, বেঁকী লম্বা ফালিখানার উতোর মাথায়, হুই আঠারো কাঠা বাকুড়ি, কসকসে কালো ধান।

ঢুলিটা ঢোল পিটাইয়া উঠে, ডুগডুগ।

দত্ত তাড়া দেয়, ম'ল রে বেটা মুচীর ডিম, ঢোল পিটতে লাগলি যে ? ঢোল গলায় ঝুলিয়ে এসেছিস্ ঝুলিয়ে চল্, আসবার সময় গাঁয়ে একবার পিটেছিস, যাবার সময় একবার দু ঘা, বাস্, আইন রক্ষে।

গোপনে একটা অজ্ঞাত প্রয়াস কেমন আপনি আসে ; মানুষের মন তো, বুকে একটু অপহরণের লজ্জাও জাগে, তারই তরে উচ্চধ্বনিতে অধিকার ঘোষণা করিতে বোধ করি কেমন লাগে।

দত্ত বলে, হ্যাঁরে গোবিন্দে, জোলের সেই চার বিঘে বাকুড়ি, সেথায় চল্ না আগে।

নগদী বলে, চার বিঘে বাকুড়ি তো গোষ্ঠর নয়. ও তো দেবেন্দ পালের, তারই ওপর গোষ্ঠর বারো কাঠা একখানা।

অ্যাঁ, ওটা গোষ্ঠর নয় ? ওই বাকুড়ির তরেই তো তোমার এত আটুবাটু ; বলিস্ কি ? না না, তুই জানিস্ না, ও গোষ্ঠরই বটে।

তবে দাও গা তুমি ওই জমিতেই বাঁশ গেড়ে, তোমার তো কাজই ওই।

দত্ত খিঁচাইয়া উঠে, উঃ, বেটা আমার ধর্মপুত্তর যুধিষ্ঠির রে!

সহসা একটা ভীষণ রুদ্র গর্জনে সব কয়টা লোক চমকিয়া উঠে। উঠিবারই কথা, এমন হাঁক মানুষের কণ্ঠনলী দিয়া বাহির হয় না।

সব চারিদিকে তাকায়, দুইটা লোক তীরের মত মাঠের পথে ছুটিয়া আসিতেছে, হাতে লাঠি, আর কণ্ঠে ওই হাঁক। ঢোলটা বগলে চাপিয়া মুচিটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে, সঙ্গে সঙ্গে দত্তর রাখালটা, তাহার পিছনে পিছনে জমিদারের নগদী।

সে বলিয়া যায়, পালাও দত্ত, পালাও, গোষ্ঠ আর রাম ভল্লা, দাগী ডাকাত, পালাও।

আর সে কি বলে, শুনিতে পাওয়া যায় না।

দত্তর সম্মুখে পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল আদালতের পেয়াদা, ঝপ করিয়া পাশের জমিতে লাফাইয়া পড়িয়া দত্ত কাদায় কাদায় ছুটে। বকের মত লম্বা পায়ে ধানের পাতা জড়াইয়া জমির কাদার জলে দত্ত পড়িয়া গেল। উঠিবার অবকাশ হইল না, পাঁকে-জলে পাঁকালমাছের মতই বেচারী হাঁপাল মারিয়া চলিতে চায়। বহু ব্যগ্রতায় উঠিয়া আবার ছুটে; মুখের একপাশে কাদা লেপিয়া গিয়াছে, চোখে কাদা, দেখিতে পায় না, মুখে কাদা, থু-থু করিয়া ফেলিতে ফেলিতে ছুটে, দেখব শালাকে, থু এমন কাণ্ড, থু, আদালতের হুকুম, অ্যাঃ থু-থু গোবর, না কি আর কিছু, অ্যা হ্যা-হ্যা থু-থু। যাঃ শালা, কাছা খুলে গেল।

বিপদের উপর বিপদ। জলে-কাদায় ভারী কাপড় লিকলিকে কোমরে থাকে না, কাছা খুলিয়া যায়, বেচারী দুই হাতে কোমরের

কাপড় চাপিয়া ধরিয়া ছুটে, ওদিকে ভিজা কাপড়ে পায়ে পা জড়ায়, শেষে দত্ত কাপড় বগলে পুরিয়া ছুটে।

রাম ভল্লা হা হা করিয়া হাসিয়া সারা ; পুত্রশোকের মাঝেও গোষ্ঠর হাসি পায়।

ওস্তাদ কহিল, তারপর, এইবার জমিদারের পালা, পারবি সামলাতে ? না পারিস্ তো স'রে যা কোথাও।

গোষ্ঠ কহে, তুমি ?

আমার কথা ছাড়, আমি ভিন গাঁয়ের ; তার ওপর লোকে শুধু তো আমাদিগে ঘেন্নাই করে না, ভয়ও করে ! তা হ'লেও আমিও দু'দিন সরব, হিমিকে নিয়ে জামাইয়ের বাড়ি যাব।

তাই দেখি। কণ্ঠটা কেমন হতাশায় হিম, তাহার উত্তেজনা শীতল হইয়া আসে। আকাশ-পাতাল ভাবে, যাইবে কোথায় ?

রাম কহে, ভাবছিস্ কি ? না হয় গাঁ থেকে চ'লে যাবি। বলে না সেই, 'সমুদ্দে পাতিয়া শয্যা শিশিরে হ'ল ভয়' ; তোর হ'ল সেই বিত্তান্ত।

গোষ্ঠ তবু নীরব, সে ভাবে।

রাম কহে, আর কি নিয়েই বা থাকবি গাঁয়ে, মেমতাই বা কিসের তোর ? জমি তো তোর যাবেই, যমে ছুঁলে আঠার ঘা—তা এ তো মহাযম।

তবু ওস্তাদ, গাঁয়ে মায়ে সমান কথা।

তা হ'লে বাবা, আমার মত হ'তে হবে, বুকের পাটা আর হাতের লাঠি এই আশ্রয়, এই ছাড়া উপায় নাই।

তাই, তাই হবে ওস্তাদ।

গ্রাম প্রবেশমুখে ও পাড়ার নবীন মোড়ল কহে, গোষ্ঠ, পঞ্চাশ টাকা।

কি ?

জরিমানা, গোমস্তা করেছে। আবার শেয়াল বেটা জমিদারের বাড়ি ডাকাত যাবে। তা দিলি, বেটার বগের মত ঠ্যাং দুটো সেরে দিতে নারলি ? উই, উই যে বেটা, আড়ে আড়ে সরছে। ও দত্ত! দত্ত! দত্ত!

আবার বুকটা কেমন দমিয়া যায়, গোষ্ঠ বাড়ি আসিয়া সদর-দরজায় খিল আঁটে।

চৈত্রের ঘূর্ণি ক্ষীণজীবী যে; আকাশ-বাতাস-ধরণী সব আগুন না হইলে ঝড় পরমায়ু পাইবে কোথা ?

শ্রাবণ-গগনে মেঘ যেন পাগল হইয়া উঠিল।

বর্ষণ-মুখর মেঘলা দিনে মন আরও উদাস হইয়া উঠে, শোকাহত দুইটি প্রাণীর দিন নীরবে অতি দীর্ঘ হইয়া কাটে।

দামিনী ঘরের মাঝে, গোষ্ঠ দাওয়ায়; খাওয়ার উদ্যোগ পর্যন্ত নাই, বুভুক্ষা পর্যন্ত যেন মূক হইয়া গিয়াছে।

তারাহীন মেঘাচ্ছন্ন তামসী রাতি, দীপহীন গৃহ, সেও অমনই ধারায় কাটে।

তন্দ্রাচ্ছন্নতার মাঝে মেঘ ডাকে, গোষ্ঠ চমকিয়া উঠে।

দুয়ারে কে ঘা মারে না ? ভ্রম ভাঙিলে একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

দুয়ারে ঘা পড়িল; প্রভাত না হইতে জীর্ণ দ্বার সবল দম্ভ-ভরা আঘাতে ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল; মোটা গলায় হাঁক আসে, গোট্যা, আরে এ গোট্যা, হারামজাদা বদমাশ !

প্রভাতের তন্দ্রা, সদ্য-যাওয়া ছেলেটার স্মৃতি, স্বপ্নে-দেখা তাহার কচি মুখ, শোক, শক্তি সব যেন ঝ'ড়ো হাওয়ার ফুল-ঝরার মত ঝরিয়া পড়িল,

গোষ্ঠ বিহ্বলের মত বলিয়া উঠিল, জমিদারের পেয়াদা, আমাকে ধরতে এসেছে।

দামিনী নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল, কিন্তু কথা কহিল না, ছেলে যাওয়ার চেয়েও যেন বড় বিপদের আশঙ্কায় বুকটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল।

দুয়ারে আরও জোরে ঘা পড়িল, শূয়ারকি বাচ্চা, খোল্ কেঁয়াড়ি।

গোষ্ঠ অস্থির হইয়া উঠিল, মনে পড়িল, হাতের উপর ইট, নাল-মারা জুতা, বুকের কাঠ, ওঃ, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে যে!

আবার খাজনা, তাহাও বাকি; মনে পড়ে খাজনা, মামুলী চাঁদা, সেস, সুদ, চেকের দাম, নজরানা, তলবানা, তহুরী, আমলা-খরচা, থিয়েটারবৃত্তি।

বাবের আর অন্ত নাই, সে বাবের এক কানাকড়িও মাফ নাই। সব লোলুপ গ্রাসে হাঁ করিয়া আছে, অনন্ত ক্ষুধায় শ্মশানের কুকুরগুলার মতই জিভগুলা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, লালসায় উষ্ণ বিষের মত লালা গড়াইতেছে।

গোষ্ঠের দেহের হাড়গুলা অবধি কন্‌কন্ করিয়া উঠিল, উঃ! এতগুলা তীক্ষ্ণ হিংস্র দন্তপাটিতে এই জীর্ণ হাড় কয়খানা পিষিয়া ফেলিবে যে!

সে ত্বরিত পদে খিড়কির দুয়ারপানে ছুটিল, মৃদুকণ্ঠে কহিল, বলো, ঘরে নাই, কোথা জানি না।

মায়ের বুকেও সন্তান যাওয়ার বিপুল বেদনা উবিয়া গিয়া আশঙ্কার মেঘ গুর্‌গুর্ করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

দামিনী ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল, ততক্ষণে অতি সন্তর্পণে খিড়কির দুয়ার খোলার শব্দ উঠিল।

দামিনী চীৎকার করিয়া ডাকিতে যাইতেছিল, ওগো!

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে জীর্ণ দুয়ারখানা মড়মড় শব্দে ভাঙিয়া

পড়িল ; সঙ্গে সঙ্গে দরজা মাড়াইয়া ঘরে ঢুকিল জমিদারের খোট্টা চাপরাসী।

বিভীষণ হিংস্র চেহারা, মুখখানা হইতে দেহের কাঠামো পর্যন্ত হিংস্র বুলডগের মত, মুখখানা থ্যাব্ড়া, দেহখানা বেঁটে-বেঁটে, গিঁট গিঁট পা দুই পাশে বাঁকা-বাঁকা। গলার আওয়াজ পর্যন্ত ওই কুকুরগুলার মত মোটা বীভৎস।

সে বলিতেছিল, লুকইয়ে রহবি, লুকইয়ে বাঁচবি শালা, হাঁড়ি পাকড়্কে লুকইয়ে বাঁচবি, মতলব তেরি ?—বলিতে বলিতে সে সটান ঘরে ঢুকিয়া চারিদিকে দেখে।

কাঁথা-বিছানা-বালিস উল্টাইয়া দেয়, মাচার জিনিসগুলা টানিয়া নীচে ফেলে, লাঠির ডগায় হাঁড়ি উল্টাইয়া ভাঙিয়া ঘরখানাকে তছ্নছ্ করিয়া ফেলে।

আরে, এ শালা তব্ গেইলো কোথা ? ভাগলো, না কা ?

কণ্ঠে তাহার যেন লুকোচুরি-খেলার কৌতুক ঝরিতেছিল।

দামিনী এই অবসরে উঠানে নামিয়া কোথায় যাইবে ভাবিতেছিল, সহসা পিছন হইতে খোট্টাটা অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়া উঠিল, তুহভি ভাগবি মতলব, তোক্রাকে হানি লিয়ে যাবে কচহারি, চল্।

বলিয়া হাসিতে হাসিতে জিভ বাহির করিয়া আগাইয়া আসে, শ্মশানের কুকুরগুলা ঠিক অমনই ভাবেই লোল জিহ্বায় কোলাহল করিতে করিতে শবগুলার পানে আগাইয়া যায়।

কঙ্কালের মধ্যে যেটুকু জীবনের অবশেষ অশেষ কষ্টে বাঁচিয়া থাকে, সেইটুকুই চীৎকার করিয়া উঠে, যতটুকু শক্তি তাহার থাকে, নিঃশেষে প্রয়োগ করিয়া ছুটে।

কোথায় ? কোন্ দিকে ?

পথহারা নারী, গোষ্ঠের পদরেখা ধরিয়া খিড়কির পানেই ছুটিল।

দুর্বলা, আত্মহারা নারী, তাহার গতি কতটুকু, ওই হিংস্র জানোয়ারটার সলম্ফ অনুসরণের কাছে কতক্ষণ?

খিড়কির ঘাটের কাছেই খোট্টার বীভৎস হাসিটা ঠিক কানের কাছেই বাজিয়া উঠিল; উপায়হীনা দামিনী সুবলের ঘরেই ঢুকিয়া পড়িল।

প্রাণের দায়ে মানের জ্ঞান হাজার-করা একটা লোকেরও থাকে কি না সন্দেহ।

সকল সংসার ডুবিয়া যায়; জীব জীবধর্ম লইয়া জাগে সেখানে। খোট্টার ভয়ে দামিনী মানমর্যাদা সব ভুলিয়া সুবলকে সবলে জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, মহান্ত, আমাকে বাঁচাও।

সুবল সকল হিয়া উজাড় করিয়া দিল, ভয় কি, ভয় কি?

ওদিকে খোট্টাটা দাঁড়াইয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছিল আর কহিতেছিল, হামরাকে ধর গো হামরাকে ধর, ঐসিন করকে হামরাকে ছাত্তি 'পর আ যাও, ডর কুছ রহবে না।

ওই একটা কথায় স্থান কাল পাত্র সমস্তটার রূপ পাল্টাইয়া যায়; শুধু বাহিরে নয়, অন্তরের মাঝেও আর একটা পর্দা খুলিয়া যায়, হৃদয়ের সমস্ত কদর্যতা অস্থির হইয়া উঠে।

দামিনী সুবলকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়; সুবলের বুকের ভিতরটা একটা উদ্দাম ক্ষুধায় তোলপাড় করিয়া উঠে।

দামিনীর অঙ্গের ওই কোমল স্পর্শ শিরায় শিরায় আগুন ধরাইয়া দেয়, সে খোট্টাকে কহে, মেয়েমানুষকে—

আর মেইয়ামানুষ, ওক্‌রাকে হামি জরুর লিয়ে যাবে, ওক্‌রা ভাতারকে জরূমানা কৌন্ দিবে? উ শালা ভাগিয়েসে তো এক্‌রাকে হামি লিয়ে যাবে।

দামিনী অস্থির হইয়া উঠে।

সুবলও জরিমানার টাকা কয়টা দিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠে।

এ যেন দামিনীকে কিনিবার একটা সুযোগ!

খোট্টাকে একটা টাকা দিয়া সে কহিল, চলো সিংজী, ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি দিয়ে আসছি। কত জরিমানা?

টাকাটা বাজাইতে বাজাইতে খোট্টা কহে, পচাশ—পচাশ রূপইয়া, কৌড়ি না কম। আউর খাজনা, উ ভি পচিশ তিশ হোগা।

আর সে তাগিদ করে না, হাসিমুখে চলিয়া যায়। ঠিক যেমন চীৎকার-রত কুকুরকে এক টুক্‌রা হাড় ছুঁড়িয়া দিলে সকল রব বন্ধ করিয়া হাড়মুখে করিয়া রাস্তা ছাড়িয়া সে চলিয়া যায়, তেমনই ভাবে।

দামিনী কহিল, টাকা তো নাই মহান্ত।

সুবল সলজ্জ অস্থিরভাবে কহিল, তার জন্যে তু—তুমি ভেবো না।

তা—তা সে কথা কি কাউকে বলে? বলিয়া সে লজ্জায় রাঙা হইয়া টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

পাপ, সাপের মতই তাহার আকৃতি, গোপনতার মধ্যে তাহার বাস, তাই মানুষ গোপনতার আড়ালে যে ক্রিয়া দেখে, তাহাকেই পাপ বলিয়া সন্দেহ করে।

দামিনীও সুবলের এই টাকা দেওয়ার সত্য গোপনের প্রয়াসে পাপের ছাপই দেখিতে পাইল, তুনিয়ার দয়াধর্ম সব যেন বীভৎস কুৎসিত কালিতে কালো হইয়া গেল।

বুকখানা কেমন অস্থির হইয়া উঠে, বিনিময়ে সে যে দিবার কিছু খুঁজিয়া পায় না।

তবে?

নিরুপায় মন বলিয়া উঠে, তবে আর কি, এ তো ঋণ লওয়া লইল না, সেদিনের মত দুইটি টাকার দাদনও এ নয়—এ দাম, দাম, তোমার দাম, বিকাইলে, তুমি বিকাইলে।

দামিনী যেন উন্মাদ হইয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া উঠিল, না না না, মহান্ত, না।

কিন্তু কোথায় মহান্ত, সে তখন চলিয়া গিয়াছে।

দামিনী ছুটিল, না না, মহান্ত, না। খিড়কির ঘটে আসিয়াও দেখিল সুবল নাই; দামিনীর ইচ্ছা হইল, ওই ভরা ডোবাটার বুকে লুকায়।

কিন্তু কে যেন পিছন হইতে টান দিয়া কহিল, বিকাইয়াছ যে!

দামিনী বিহ্বলার মত ফিরিতেই দেখিল, আঁচল টানিয়া সাতু।

ছিঃ, বউ!

দামিনীর বুকখানা গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিল।

সাতু ছিছিকার করে কেন? তবে কি এই বিকিকিনির কাহিনী—

দামিনীর বাক্য ফুটিল না, সাতুর মুখপানে চাহিয়া রহিল—বিহ্বল দৃষ্টি।

সাতু কহিল, ছি বউ, দাদার কি সর্বনাশই করবি, হাতে দড়িই দিবি? গাছের সব ফল কটাই কি থাকে? ভাগ্যে আমি গলা শুনে এসেছিলাম, নইলে কি হ'ত বল্ দেখি? ভগবান রক্ষে করেন, কাল থেকে আমি ও-পাড়ার মাসীর বাড়িতে ছিলাম, এসে কেবল বাড়িতে পা দিয়েছি, আর শুনি 'মা মা' ব'লে তুই চেঁচাচ্ছিস্। সর্বনাশ সর্বনাশ। আয়, ঘরে আয়, বুক বাঁধ, সব হবে আবার।

দামিনী সাতুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিল, কি হবে ঠাকুরঝি?

মাথায় হাত বুলাইয়া সাতু কহিল, হবে আবার কি, সব হবে, একবার যখন কোঁক ফলেছে, তখন আবার হবে, খোকা তোর বেড়াতে গিয়েছে। নে, বুক বাঁধ্, সব হবে। ও মা, চুলে যে জট পড়েছে লো, আয় দেখি, চুল কুঁড়ুলে দি, ব'স্।

চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া ফাঁস ভাঙিতে ভাঙিতে সাতু গল্প করে, দামিনীর কিন্তু কানে যায় না, সে যেন ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠে।

সাতু যাইবার সময় কহে, এই নে, এ দুগাছা রাখ্ ভাল কাজে দিস, তার ভাল হবে, না হয় মা ষষ্ঠীকে নোটন গড়িয়ে দিস্, সেদিন আমি নিয়ে রেখেছিলাম। ছেলেটার সেই জীর্ণ বালা দু'গাছা। সাতু দামিনীর আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া যায়।

এদিকে আকাশে বুঝি ভাঙন ধরে—ঝরঝর অবিরাম ধারা।

দামিনী আশ্বাসে বুক বাঁধিতে চায়, কিন্তু বাঁধা যায় না। উপায়ের বাঁধ পাইলে তো নিরুপায়ের ভাঙন বাঁধা যায়, কিন্তু উপায় যে দামিনী পায় না। মনে হয় স্বামী শোধ দিবে।

পরক্ষণেই মনে পড়ে, কাবুলীর ভয়ে ঘরে খিল দেওয়া, সন্তানের চিকিৎসার সম্বল মহাজনের হাতে সঁপিয়া দেওয়া, জমিদারের ভয়ে পালানো—হতাশের ভাঙন দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়।

মনে হয় সুবল আসিয়া হয়তো—। দামিনীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতে চায়, কিন্তু সে শক্তিও যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

খুটখুট।

বুকের স্পন্দন বুঝি নিস্পন্দ হইয়া গেল, বুঝি সে আসিল।

অতিকষ্টে ফিরিয়া দেখে, কাকটা ঘর-নিকানো পেলেটার কানায় বসিয়া সেটা উল্টাইয়া দিল।

স্বস্তির একটা নিশ্বাস বুকখানাকে হাল্কা করিয়া দেয়। আঃ!

চিন্তায় চিন্তায় চিন্তার বস্তু হারাইয়া যায়, লক্ষ্যশূন্য একাগ্র দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া থাকে।

আবার শব্দ হয়, দামিনী চমকিয়া যেন জাগিয়া উঠে, এবার রোঁয়া-ওঠা শীর্ণ কুকুরটা ঘরে ঢুকিয়া গিন্নীপনা করিতেছে দেখা যায়। মর্মদাহী চিন্তার গুমটের মাঝে স্বস্তির বাধা পাইয়া দামিনী যেন বাঁচিয়া যায়, যতক্ষণ পারে অবসরটুকু ধরিয়া রাখিতে চায়।

কুকুরটাকে তাড়ায়, দূর দূর।

পরমুহূর্তেই অবার চিন্তায় ডুবিয়া যায় ; কুকুরটা বাহির হইল না, সে খেয়াল আর থাকে না।

ওই বাধার ক্ষণটুকু জলমগ্নের প্রাণপণে মাথা তুলিয়া নিঃশ্বাস লওয়ার মতই ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী।

ক্ষণের পাখায় সময় চলে, সে বোধও নারীটির থাকে না।

আবার শব্দ হয়, এবার সত্য সত্যই সুবল আসিয়া দাঁড়ায় ;—অস্থির ভঙ্গী, দৃষ্টি কেমন।

সমস্ত শরীর দামিনীর কেমন করিয়া উঠে।

সুবল কহিল, দিয়ে এলাম।

উত্তর যোগায় না, কণ্ঠ যেন রুদ্ধ, একটা কাজ পাইবার জন্য দামিনী ব্যাকুল হইয়া উঠে।

এই রসিদ।—একখানা কাগজ সুবল নামাইয়া দেয়।

দামিনীর হাত যেন অবশ, কাগজখানা পড়িয়াই রহিল।

তবুও যে সুবল যায় না।

তবে ?

বিনিময় চাহিবে, দাম দিয়াছে, দেহ চাহিবে !

বউ !—সুবলেরও কথা যোগায় না, কানের পাশ দিয়া আগুন ছুটে, বুকের ভিতরটা টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটে।

বউ !—এবার সুবল দামিনীর হাতখানা চাপিয়া ধরে, সুবলের হাতে যেন আগুন ছুটিতেছে, আর এ যেন হিম, অহল্যার দেহ বুঝি পাষাণ হইতে শুরু করিয়াছে।

তবু দামিনী অস্থির চঞ্চল কণ্ঠে কহিল, তোমার পায়ে পড়ি, এখন যাও।

সুবল বেত্রাহতের মত পলাইয়া গেল।

সুবল গেল, কিন্তু সুবলের অস্তিত্বের আভাস গেল না, ও-বাড়িতে খুট শব্দ হয়, অস্থির পদশব্দে তার বুকের কথা দামিনীর কানে বাজে।

সে শব্দ খিড়কির দুয়ার পর্যন্ত আগাইয়া আসে, কখনও গোষ্ঠর বাড়ির দুয়ার পর্যন্ত, আবার ফিরিয়া যায়।

এমনই সারাটা দিন, সন্ধ্যায়ও তাহার বিরাম নাই।

গ্রাম নিযুতি হইয়া আসিল, পদশব্দ আরও আগাইয়া আসে, রাত্রি অন্ধকার, দামিনী কাঠের মত বসিয়া।

নীরবে দুইখানা হাত দামিনীর হিমানী-শীতল দেহখানা জড়াইয়া ধরিল, সর্বশরীরে সে যেন ক্লেদাক্ত সরীসৃপের স্পর্শ। নারী-দেহখানা আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিল।

* * * *

রাত্রি শেষ হইয়া আসে, দামিনী তেমনই নিস্পন্দ বসিয়া।

কিন্তু অন্ধকার যত তরল হইয়া আসে, দামিনী তত অস্থির হইয়া উঠে, মাটির বুকে লুকাইতে সাপের গর্তের মত একটা গর্ত খোঁজে, স্যাঁতসেঁতে, ময়লা, ছোট। কিংবা এই রাত্রিটা যদি প্রভাত না হয়, এই অন্ধকার যদি বৎসর, যুগ, না, প্রলয়ান্তব্যাপী হয় !

আঃ, তাহা হইলে বাঁচে সে।

সম্মুখেই সেই কাগজখানা পড়িয়া, সুবলের দেওয়া সেই রসিদটা, সেটা সে স্পর্শ করিতে পারে না। একদৃষ্টে দেখে।

মনে হয়, ওই কালো কালো গুটি গুটি দাগের মধ্যে তাহার ওই ইতিহাস লেখা আছে।

শরীর মন শিহরিয়া উঠে।

আবার কাহার টিপিয়া টিপিয়া পা ফেলার শব্দ হয়; দামিনীর বুকে আর উদ্বেগ জাগে না।

বাবা, যে বান! কে?

শ্বেতবস্ত্রাবৃত দামিনীকে দেখিয়া গোষ্ঠ চমকিয়া উঠে; তারপর চিনিয়া বলে, ও, তুমি! খোট্টা আর আসে নাই?

দামিনী কথা কয় না।

একবার মনে হয়, ওই রসিদখানা আগাইয়া দেয়, চীৎকার করিয়া অভয় দেয়, ভয় নাই ভীরু, ভয় নাই।

আবার নিজেরই ভয় হয়, অতি যত্নে কাগজখানাও লুকাইয়া ফেলিতে ব্যগ্রতা জাগে। কিন্তু দুইটার একটাও হয় না, কাগজখানা স্পর্শ করিতে পারে না; অন্তরের অহল্যা বুঝি পাষাণ হইয়া গিয়াছে।

গোষ্ঠ বলে, যে বান, গাঁয়ে ঢুকল ব'লে। ক্ষণপরে আবার কহে, আর গাঁয়ের পিতুল নাই, বানের আগে শ্মশান এসে গাঁয়ে ঢুকছে।

ব্যগ্রভাবে দামিনী প্রশ্ন করে, আর কত দেরি?

প্রশ্নটার তাৎপর্য গোষ্ঠ বুঝিতে পারে না, দামিনীর মুখপানে চাহিয়া থাকে।

আবার বর্ষণ প্রবল হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলো ক্ষ্যাপা হাওয়া।

পশ্চিমের দিগন্তে বুঝি কোন ঘুমন্ত সুবিশাল অজগর সদ্য জাগিয়া ধরণীগ্রাসে আগাইয়া আসিতেছে।

কালো মেঘের বুক চিরিয়া তাহার রক্তজিহ্বা ঘন ঘন লক্‌লক্ করে; সমস্ত সৃষ্টিটা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে; আকাশস্পর্শী বৃক্ষশীর্ষ তাহার বিষনিঃশ্বাসে মাথা আছড়াইয়া মরে; উচ্চ গৃহচূড়ের পাশ দিয়া সে নিঃশ্বাস গর্জিয়া যায়—গোঁ-গোঁ, পাষাণপুরীর অন্তস্থল পর্যন্ত চাড় খাইয়া চড়্‌চড়্ করিয়া উঠে। বৃষ্টির ছাঁট—হাওয়ার দাপটে অসহ তীক্ষ্ণ, সে যেন বিষের ছিটা, মৃত্যুর হিমানী মাখা।

দাওয়ার উপর এমনই একটা দাপটে গোষ্ঠ ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলে, ঘরে এস গো, ঘরে এস।

দামিনীর এ প্রলয়তাণ্ডবে কেমন একটা উল্লাস জাগে, সে কথা কহিল না, শুধু সমস্ত অন্তর উন্মুখ করিয়া ওই প্রলয়লীলার উন্মত্ত আলিঙ্গনের মাঝে নিজের অস্তিত্ব লুপ্ত করিয়া দিতে চাহিতেছিল।

ঘরখানার চালের পাশ দিয়া আবার একটা প্রবাহ বহিয়া যায়, সে বিষনিঃশ্বাসে ঘরখানার হাড়-পাঁজর মড়্‌মড়্ করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠে, চাল করিয়া উঠে মচ্‌মচ্।

গোষ্ঠ শিহরিয়া ত্রস্তভাবে কহে, পিঁড়েখানটা কই গো, পিঁড়েখানটা পবন-দেবতাকে বসতে পেতে দি উঠোনে।

পিঁড়িখানা গোষ্ঠ উঠানে পাতিয়া দেয়, বলে, শান্ত হয়ে ব'স ঠাকুর, শান্ত হয়ে ব'স।

দেবতা শান্ত হয় না; আবার ঝড় গোঙায়, দামিনীর পাশ হইতে রসিদখানা ঝড়ে উড়িয়া যায়।

দামিনীর বুকখানা কত হাল্কা হইয়া উঠে!

গোষ্ঠ আর্তকণ্ঠে ডাকে, হে ভগবান্, রক্ষে কর প্রভু, রক্ষে কর। আবার কহে, ডাক গো, ভগবানকে ডাক এ সঙ্কটে।

না।—অতি স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

গোষ্ঠ হতভম্বের মত দামিনীর পানে তাকাইয়া বলে, ক্যানে?

কি হবে ডেকে?

প্রশ্নের উত্তর নাই, নির্বাক বিস্মিত নেত্রে গোষ্ঠ দামিনীর পানে চায়; বৃষ্টির দাপট স্বামী-স্ত্রীকে ভিজাইয়া, দাওয়ার দেওয়াল পর্যন্ত ভিজাইয়া দেয়, গোষ্ঠ ত্রস্ত শিশুর মত ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া বসে, দামিনী-কেও ডাকে, এস, এস, ঘরকে এস গো।

দামিনী কথাও কহিল না, উঠিলও না, বসিয়াই রহিল।

গোষ্ঠ এবার বিরক্ত হইয়া কহিল, তোমার হ'ল কি বল দেখি? দুঃখ কি আমার হয় নাই, না কি তোমার একারই হয়েছে?

দামিনী উন্মাদের মত কহে, কত দুঃখ, কত দুঃখ তোমার হয়েছে? মরতে মন হয় তোমার? হয়?

হা-হা করিয়া হাসিতে ইচ্ছা করে তাহার; ওপাশ হইতে একটা বিপুল আর্তনাদ, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভয়ার্ত চীৎকার; ওই চীৎকারে তাহার সম্বিৎ আবার ফিরিয়া আসে।

বুকের মানুষটি একেবারে মরে না।

দেহের কষ্টে, মরণের ভয়ে যে গোষ্ঠ শিশুর মত চারিখানা দেওয়ালের ভিতর মাটি-মায়ের কোল খুঁজিতেছিল, সেও ওই বিপুল আর্তনাদে ছুটিয়া গিয়া বাহির-দুয়ারে দাঁড়ায়।

বৃষ্টির আবরণ ভেদিয়া সকল শক্তিপ্রয়োগে তীব্র বিস্ফারিত-দৃষ্টি হানে; সব আবরিত করিয়া বর্ষার শুভ্র ধারা, কিছু দেখা যায় না।

আন্দাজ করিয়া বলে, কার ঘর উড়ল, টিনের শব্দ, টিনের ঘর!

কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গীতে আর সে কাতরতা নাই, পরের অবস্থা দেখিয়া সেও যেন প্রস্তুত হইয়া উঠিল।

সে নিজের ঘরের পানে তাকায়, ঘরখানা এক-একবার ঝড়ের বেগে দেওয়াল ছাড়িয়া উঠে।

বাহির-পথ হইতে হাঁক আসে, এ গুস্টা, গুস্টা!

জমিদারের খোট্টা চাপরাসী।

মূহূর্ত পরেই ভাঙা দুয়ার দিয়া খোট্টা আসিয়া গোষ্ঠের হাত ধরিয়া টানে; বলে, আও, কোদারি লেকে আও, কচহারিমে বান উঠিয়েছে।

জমিদারের ভয়ের চেয়ে ভীষণতর ভয় গোষ্ঠর সম্মুখে, সে তাহারই জন্য বুক বাঁধিতেছিল।

আজ খোট্টার রক্ত-আঁখি তাহার তুচ্ছ ঠেকিল, সে হাত টানিয়া মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, আর আমার ঘর উড়ুক, ঘর-সংসার ডুবে মরুক, পারব না যেতে আমি।

গালি দিয়া খোট্টা দরিদ্রের ঘাড়ে ধাক্কা মারে, চল্ শালা চল্।

রিক্ততা শুধু বঞ্চনাই করে না, সর্ব প্রকার সঙ্কোচ হইতে মুক্তও করে মানুষকে; উলঙ্গ শক্তি লইয়া রিক্ত জন মরিয়া হইয়া জাগে।

বুকের মাঝে আবার ঘূর্ণি জাগে, সমস্ত শরীরের রক্ত ঝাঁঝিয়া উঠে, গোষ্ঠ ঘুরিয়া খোট্টাকে নিঃসঙ্কোচে সজোরে ধাক্কা মারে; পিছল মাটিতে ধাক্কার বেগে সে মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়ে।

বিপুল ক্রোধে খোট্টা উঠিয়া বসিতে না বসিতেই হাতের লাঠি হানিল। বেকায়দায় হানা দুর্বল লাঠি গোষ্ঠ সহজেই ধরিয়া লইল, বিদ্রোহী ঝড়ের ছোঁয়াচে মরিয়া মস্তিষ্কে তাহার যেন খুন চাপিয়া যায়, সজোরে সেই লাঠি খোট্টার মাথায় বসাইয়া দিল।

বৃষ্টির জল লালচে হইয়া গেল, ফিনকি-দেওয়া রক্তের ধারায় মাটির খানিকটা, উপরের বৃষ্টির ফোঁটা কয়টা পর্যন্ত।

রক্ত দেখিয়া গোষ্ঠ শিহরে না, স্থির দৃষ্টিতে দেখে। দামিনীরও ভয় হয় না, মনে তৃপ্তি যেন জাগে, লাঞ্ছিতা নারীর বুকে দুঃশাসনের রক্তে পাঞ্চালীর উল্লাস জাগিয়া উঠে।

আইনে অত্যাচারীকে হত্যার অধিকার নাই।

গোষ্ঠ বসিয়া ভাবে।

ক্ষণপরে আপন মনেই বলে, সেই ভাল, কিসের তরে থাকব, জমি গেল, ছেলে গেল ; দুটো পেট যেখানে খাটাব, সেইখানে ভাত ; এখানেও খাটা, বাইরেও খাটা। ঘর ? গাছতলা তো আছে।

আবার ঝড় গোঙায়।

উঠানের ওপাশের বড় আমগাছটি শিকড় শুদ্ধ উপড়াইয়া পড়িল। সে কি শব্দ ! গাছটার মরণের আর্তনাদ যেন !

তলার আগাছার দল, হাওয়ায়, জলে, মেঘলা দিনের ম্লান আলোকে উন্মত্ত পুলকে লুটাপুটি খাইয়া মরে।

উঠানে জল ঢোকে, গোষ্ঠ কহে, বান।

খোট্টার দেহটা টানিয়া ওপাশের সার-ডোবায় ফেলিয়া দিয়া দামিনীর হাত ধরিয়া বলে, এস।

নিঃসঙ্কোচে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া দামিনী উঠিয়া দাঁড়ায়, প্রশ্ন পর্যন্ত করে না, কেন, কোথায় ?

পাতানো ঘরসংসারের পানে ফিরিয়া তাকায় না পর্যন্ত ; গোষ্ঠও না।

মুক্তির কামনায় মায়া টুটে।

দামিনী আগে পা বাড়াইয়া বলে, চল।

উন্মত্ত ঝড়বৃষ্টির মাঝে ওই আগাছাগুলার মত লুটাপুটি খাইতে খাইতে পথে বাহির হয়, নূতন আশ্রয়ের তরে।

কোথায় সে আশ্রয়? বন-জঙ্গল হয়তো।

চলিতে চলিতে গোষ্ঠ বলে, এস, ওই বটতলাতে দাঁড়াই, এমন ক'রে ঝড়ে জলে মরার চেয়ে চাপা পড়া ভাল।

আবার ক্ষণপরে কহে, ঠিক বলেছ, কি হবে ভগবানকে ডেকে? ভগবান নাই, নইলে, একজন অট্টালিকায় ঘুমোয় আর দশজন রোদে পোড়ে, ঝড়ে বাদলে মরে?

দামিনী কথা কয় না, দাঁতে দাঁতে তাহার একটা শব্দ হয়; সে শীতের কম্পন, না আক্রোশের ঘর্ষণ, কে জানে।

আধা শহর।

কালো কালো পাথরের কুচি দেওয়া চওড়া রাস্তা। দুই পাশে দোকান—পান-বিড়ি, মিষ্টি, মনিহারি, চকচকে ঠুনকো জিনিসে ভরা, সবারই মাঝে একটা বহিঃসৌন্দর্যের আস্ফালন।

ওপাশে রেলস্টেশনের ধারে স্তূপ বাঁধা কয়লার ডিপো, কালিতে রাস্তাঘাট কালিমাখা, সব যেন রুক্ষ, রৌদ্রে কয়লার স্তূপ ঝাঁঝে ভরা। আশপাশ পর্যন্ত ওই উত্তাপে তপ্ত।

লোহার দোকান, শুধু ঝনঝন শব্দ, মাটির বুক ফালি ফালি করিয়া ফাঁড়িয়া ফেলিবার কত কত অস্ত্র—টামনা, গাঁইতি, শাবল, যেন তীক্ষ্ণ হিংস্র, রৌদ্রের আলোয় চকচক করে।

ধারে ধারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা ঘিরিয়া ধানের কল, বয়লারের আঁচে গরম জলের ভাপে সব যেন আগুন।

দুইটা বাজারের মাঝে স্টেশন, মস্ত জংশন।

সারি সারি কালো কালো সুকঠিন লোহার লাইন, মাটির বুক চিরিয়া পাতা; লোহার বাঁধনে দুনিয়াটাকে বাঁধিবার কি সে উদগ্র চেষ্টা! দূর—সুদূর পর্যন্ত কালো কালো লাইনের দাগের রেশ চোখে বাজে, মনের চোখে আরও—আরও দূর পর্যন্ত, দুনিয়ার সীমারেখা পর্যন্ত—ওই রেশ আগাইয়া যায়।

মাঝে মাঝে সিগনালের স্তম্ভগুলা যেন লোহার বিশ্বজয়ের বিজয়-নিশান।

রাত্রের অন্ধকারে ওগুলার মাথায় আবার রক্ত-রাঙা জ্বলজ্বলে আলোর সারি ধকধক করে।

ও যেন মানুষের উদগ্র বুভুক্ষার উগ্রতা, রাত্রে ঘুমন্ত বিশ্বেও সে জাগিয়া আছে; আপন উগ্রতার জ্বালায় ও আপনি জ্বলে। দিন নাই রাত্রি নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই ও আপন তৃপ্তি হেতু আপন গ্রাসের কাজ চালাইয়াছেই; রেল চলে, টেলিগ্রাম চলে, মানুষ কাজ করে, বিশ্রামের হুকুম দেয় না ও। চব্বিশ ঘণ্টাই শহরটা ধ্বনিয়া রেলের বাঁশীর অশ্রান্ত তীক্ষ্ণ চীৎকার, তন্দ্রা টুটিয়া যায়, অন্যমনস্ক চমকিয়া উঠে, মস্তিষ্কের শিরা উপশিরাগুলা পর্যন্ত ঝনঝন করে; সকল শান্তি তৃপ্তি যেন শিহরিয়া উঠে। গাড়ি কাটে, গাড়ি টানে, শান্টিং হয়, গাড়িতে ধাক্কা মারে—ঘড়াং ঘড়াং আশেপাশের মাটি কাঁপে, ধরণী-মায়েরও বুঝি ভার লাগে, হাড়পাঁজরা মড়মড় করে যেন।

দারুণ বুভুক্ষায় মাতৃস্তন্যে তৃপ্তি হয় না উহাদের, মায়ের বুক চিরিয়া নিঃসঙ্কোচে রক্ত শোষণ করে।

মালের গাড়ি সব বোঝাই হয়, ধানে চালে আহারের সামগ্রীতে বোঝাই করে, আহার যাহাদের জোটে না তাহারাই।

মাটিতে মাথা বুঝি ঠেকিয়া যায়, কাঁথ বাঁকাইয়া গরুর গাড়ি হইতে হুইমনে বস্তাগুলো গাড়িতে বোঝাই করে অর্ধাহারী মজুরের দল।

পাশে গাড়ির গরুগুলার মুখের ফেনা ভাঙে, শ্রান্তিতে হাঁপায়, গায়ে সোঁটা সোঁটা চাবুকের দাগ, বিশ-পঁচিশমণ বোঝাই গাড়িগুলা ওই পাথরের রাস্তার উপর দিয়া জিভ বাহির করিয়া টানিয়া আনিতে কষ্ট হয়, তাই মানুষ এদের চাবকায়। নির্মমভাবে গুঁতা মারে, তাহাতে মাথা নাড়ে পাছে, তাই নাকে দড়ি দিয়া টানে।

মজুরগুলারও গা হইতে টসটস করিয়া ঘাম পড়ে, দাঁড়াইয়া দম লইতে গেলে মাড়োয়ারী মহাজন গালি দিয়া তাড়া দেয়, এ শালালোক বদমাশ, চালাও চালাও ; দের হোনেসে গাড্ডিমে ড্যামরেজ লাগেগা, চালাও চালাও।

মারিতে তাড়াও করে।

পশুর উপরে মানুষ যে অত্যাচার করে, মানুষের উপরেও তার চেয়ে কম অত্যাচার করে না , আট আনা, দশ আনা মজুরীতে ইহাদের সাত-আট ঘণ্টার আয়ু বিকায়, এই সাত-আট ঘণ্টার মাঝে এদের বাঁচিবার প্রয়াসে নিশ্বাস লইবার অধিকার নাই।

মজুরগুলার বাস ওই উত্তাপ, ওই লৌহ-বন্ধনের মাঝে, লাইনের ধারেই ছোট ছোট পায়রা-খুপীর মত ঘর—ওই মজুরের বস্তি, সমাজের আঁস্তাকুড়, অর্থশালীর ডাস্টবিন। পূর্ব দিকে কলের সারি, কালো কালো লম্বা লম্বা চিমনি, সারাদিন ধোঁয়া উদ্গীরণ করে। উত্তরেও তাই। পশ্চিমে রেলের মালগুদাম। মহাজনকে টাকা আনিয়া দেয়, আর ইহাদের আলো-বাতাসের পথ রোধ করে। রেল-ইঞ্জিনও ধোঁয়া ছাড়ে। ওদিকে দক্ষিণে মদের ভাঁটি ; হতভাগ্যদের আয়ুবিক্রয় করা পয়সাগুলা লুঠ করে।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশ পর্যন্ত কেমন ঘোলাটে, দীপ্ত রৌদ্র পর্যন্ত এখানে ম্লান।

কেমন একটা অভিভূতি আসে, মদের গন্ধে ম্লান আলোয় সব যেন কেমন নেশায় বিকারগ্রস্ত।

তবু এখানকার মানুষগুলি তন্দ্রালু নয়—জীবনের দুরন্তপনার সাড়া পাওয়া যায়, সে দুরন্তপনা বিচিত্র।

এতকালের বিশ্বের সঙ্গে মেলে না। হয়তো বা প্রেত ইহারা, কিন্তু প্রেত জীবনে জীবন্ত।

*　　　　*　　　　*

পড়ন্ত বেলা।

গোষ্ঠ আর দামিনী ওই স্টেশনটির ধারে একটা বটতলায় আশ্রয় লইয়াছিল। গোষ্ঠ পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল, সে যেন নিশ্চিন্ত। আর দামিনী বটগাছের একটা শিকড়ে হেলান দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল অন্তহীন অর্থহীন চিন্তা। কুলী-মজুরের দল, ঘরের দিকে ফিরিতেছিল।

কর্মক্লান্তির অবসাদের মাঝে খলখল উচ্ছৃঙ্খল হাসি, ইহাদের বেতালা পায়ের মলের মতই বাজিতেছিল।

মেয়েরা গান ধরিয়াছিল—

ধকধকিয়ে আগুন জ্বলে ভকভকিয়ে ধূমা,
মিস্ত্রী বলে, বয়লার আড়ে দে লো একটা চুমা।

একজন পুরুষ বলিতেছিল; দোব মাইরি এইবার শালার মাথাটা ফেড়ে, এক শাবলের ঘা, বাস, ডিমফাটা হয়ে যাবে; বাবু হ'ল তো হ'ল কি!

অপর জন কহে, শালা রোজ আমাদের হাজরি চুরি করে! উঃ,

আমরা শালারা খেটে মরব আর হাজারিবাবুর পরিবারের শাঁখের শাঁখা সোনার হবে, ইঃ—রে!

নারীকণ্ঠের সমবেত তীক্ষ্ণ উচ্চস্বরে গোষ্ঠ জাগিয়া উঠে, বিস্মিতের মত ইহাদের পানে চাহিয়া থাকে।

ওই বেতালা চাল কেমন নূতন ঠেকে, মনে খট করিয়া বাজে—আবার ওই বিচিত্র নূতন ধারার কোন সূক্ষ্মতম সুর তাহাকে আকর্ষণও করে।

সহসা পিছনের পানে একটা কোলাহল উঠে, দুইটি সমান উত্তেজিত কণ্ঠে। মজুরের দল ঘুরিয়া দাঁড়ায়, গোষ্ঠও ফিরিয়া তাকায়।

উত্তরদিকের কলের ফটকে দুইজন লোক,—একজন জামা কাপড় জুতায় বাবু, আর একজন মজুর, গায়ে হাতকাটা কামিজ, হাফপ্যাণ্ট, সারা অঙ্গে তেল-কালি মাখা, হাতে একটা হ্যামার। সে কহিতেছে, আমার খুশি, আমি 'ওপরটায়েন' খাটব না।

মজুরের দল কহে, ছোট মিস্ত্রী আর ক্যাশবাবু, শালা ভুঁড়েও কম নয়, সবেই শালা পাক মারে!

ওখানে ক্যাশবাবুটা বলে, অঙ্গ জল করে দিলে আর কি আমার; পাম্প না সারলে কল যে কাল বন্ধ থাকবে, তার কি? সে লোকসান দেবে কে? তুমি সিরাজউদ্দৌলার নাতি সরফরাজ খাঁ! বলি, মালিকের মাইনে খাও না? কল বন্ধ হবে আর লবাব ঘরে ব'সে আরাম করবেন?

মাগনা মাইনে দেয় আমায়, নয়? দাতাকর্ণ রে আমার! গতর খাটাই, পয়সা নিই; বাঁধা টায়েনের কাজ না করি, বলতে পার; ওপরটায়েন খাটা আমার গতরে পোষাবে না, আমি খাটব না, সিধা বাত।

সে দুই পা আগায়।

পিছন হইতে ক্যাশবাবু ক্রোধে ভুঁড়ি নাচাইয়া, হিন্দী বাত ছাড়িয়া দেয়, আলবাৎ খাটনে হোগা, তোমার ঘাড়কে খাটনে হোগা, উল্লুক বব্বড় কাঁহাকা।

হাতের হ্যামার উঁচাইয়া ছোটমিস্ত্রী কহিল, খবরদার মু সামাল, করো।

বাবু দশ পা পিছু হটিয়া যায় আর কহে, মারবি নাকি, মারবি নাকি রে বাপু?

ওদিকে পিছনে হাত বাড়াইয়া কলের ফটক খোঁজে।

মজুরদের একজন শূন্যে হাত হানিয়া কহে, লাগাও হ্যাম্মর, ফটাং ভস, আণ্ডা তোড় যায়।

জনকয় হাততালি দিয়া উঠে, যেন এ রুদ্র সঙ্গীতে তাল দিয়া যাইতেছে।

একজন প্রৌঢ়, সেও তেল-কালি-মাখা, সে আসিয়া ছোট মিস্ত্রীর উদ্যত হাতখানি ধরিয়া নামাইয়া লয়, মানাইয়াও লয়।

মজুরের একজন কহে, বড় মিস্ত্রী।

ওদিকে বাবু ফটক বন্ধ করিয়া শাসায়।

কাল যদি হামরা কলমে মাথা গলায়েগা তো জুত্তি লাগায়গা, পুলিসমে দেগা। জবাব তোমারা।

বড় মিস্ত্রীর আকর্ষণের মাঝেও ঈষৎ পাশ ফিরিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া ছোট মিস্ত্রী কহে, নেহী মাংতা হ্যায় তুমহারা নোকরি, কিম্মৎ থাকে আমার কাল আবার তোরাই ডাকবি।

আপন বুকে ঘা মারে, দম্ভের ঘা।

গোষ্ঠ দাঁড়াইয়া উঠে, তাহার মনের দ্বিধা টুটিয়া যায়, সকল অন্তর তাহার যেন ওই ভাবধারা বুক পুরিয়া লইতে চায়।

দামিনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠে। জ্বলে, কিন্তু ওই জ্বলনের মাঝেও প্রসন্নতার আভাস পাওয়া যায়।

ঘাড়ে পাষাণ চাপানো নতদৃষ্টি বন্দী যেন উর্ধ্বে নীলাকাশের পানে, চাহিবার উপায় দেখিতে পায়।

গোষ্ঠ কহে, বেশ ঠাঁই, হেথায় থাকা যাক, কি বল?

দামিনীর মুখপানে সম্মতির জন্য তাকায়।

দামিনীরও বেশ লাগে, হউক এ জীবন প্রেতের, কিন্তু বন্ধনহীন, হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিতে পারা যায়; সেও ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দেয়, বেশ।

গোষ্ঠ আগাইয়া চলে মিস্ত্রি দুইজনের দিকে।

ওদিকের ঝগড়া মিটিয়া গেল দেখিয়া মজুরের দল বস্তির পানে পথ ধরে।

দামিনী বসিয়া রহিল, অবসন্ন দেহে—শ্রান্তিতে, ক্ষুধায়; কাল হইতে একটা দানাও পেটে পড়ে নাই, মানুষের ভয়ে লোকালয় দিয়া পথ দিয়া হাঁটে নাই, আসিয়াছে প্রান্তরে প্রান্তরে রেখাচিহ্নহীন বিপথ ধরিয়া।

হাওয়ায় ঘোমটা খসিয়া পড়ে, সেটা তুলিয়া দিতেও হাত উঠে না; অবসাদ আসে; অবসন্ন দৃষ্টিতে সম্মুখের ছবি বেশ ধরা পড়ে না, যেন ক্ষণে ক্ষণে মুছিয়া যায়, আবছায়ার মত কাঁপে।

সমস্ত অন্তরাত্মা তাহার একটা দানার জন্য কাঁদে।

তন্দ্রার মত একটা আচ্ছন্নতা সর্বদেহ ব্যাপিয়া ফেলে, মাথাটা ঝুঁকিয়া পড়ে, ইচ্ছা করে ঘুমায়।

বউ!

দামিনীর ওই তন্দ্রা টুটিয়া যায়, পিছন হইতে কে যেন ডাকে, বউ! ফিরিয়া দেখে সুবল।

তেমনই সলাজ নতদৃষ্টি, কুণ্ঠিত ভঙ্গী।

দামিনীর সর্বদেহে একটা উত্তেজনা বহিয়া যায়; ঋণমুক্ত খাতক যে উগ্রতায় মহাজনের সম্মুখে দাঁড়ায়, সেই উগ্রতায়, সেই ভঙ্গীতে কহে, কি?

ওই একটি কথায় সুবল কাঁপিয়া উঠে, সে কথা কহিতে পারে না, শুধু হাতটি বাড়াইয়া সম্মুখে ধরে, সে হাতও থরথর করিয়া কাঁপে। হাতে একটি ঠোঙা, তাহার মাঝে খাবার, সে কত কি! যত ভাল যত রকম মেলে; তত ভাল, তত রকম উপচারে সাজানো।

দামিনীর কথা ফোটে না।

তাহার সকল ক্ষুধা উন্মুখ হইয়া ওই উপচার ধরিতে চায়, ইচ্ছা করে একই লোলুপ বিপুল গ্রাসে ওইগুলি গ্রাস করিয়া ফেলে।

তবু যেন কিসে বাধে; সে একাগ্র বিস্মিত দৃষ্টিতে সুবলের পানে চাহিয়া থাকে; ক্ষুধার তাড়নায় সে দৃপ্ত মহিমা আর থাকে না!

দামিনীর ওই একাগ্র দৃষ্টি, ওই নীরবতার মাঝে কি যেন সাহস পায়, সে কথা কয়। বলে, ছেলেবেলার কুল খাওয়ার কথা মনে পড়ে না?

দামিনী হাত বাড়াইয়া ঠোঙাটি ধরে, সে যেন বারো বছরের অনভ্যস্তা বধূটির বয়সে ফিরিয়া যায়।

তারপর সে কি বুভুক্ষার গ্রাস, সে যেন গিলিয়া খাওয়া।

সুবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে কহে, বউ, আমিও হেথায় থাকব, আমার আর সেথায় কে আছে; আমি তোমাদের সঙ্গেই এসেছি।

দামিনীর অবসর হয় না, সে খায়।

সুবল সাহস পাইয়া কত বকিয়া যায়।

আমার তো যেখানে থাকব সেইখানেই ঘর, এইখানেই ভিক্ষে করব।

দামিনী এতক্ষণে কহে, ছিঃ, ভিক্ষে!

সুবল কহে, তবে মুড়ি-মুড়কির দোকান করব, অ্যাঁ কি বল বউ? তুমি মুড়ি ভেজে দিও।

দামিনী কহে, বানি দিও। হাসিয়া দামিনী মাথায় কাপড় টানিতে খুঁট খসিয়া পড়ে, হাতে বাজে সেই সাতুর বাঁধিয়া দেওয়া বালা দুইগাছা।

সুবলের ইচ্ছা করে, মুখে তুবড়ির মত কথার ফুলঝুরি ছুটাইয়া দেয়; কিন্তু পারে না; কথা যোগায় না, শুধু অনেক চেষ্টায় বলে, সবই তোমাকে দোব বউ।

ক্ষুধার নিবৃত্তিতে দামিনীর সহজ বৃত্তি জাগিয়া উঠে, তাহার মনে পড়ে সে দিনের কথা।

সে যেন পাগল হইয়া উঠে, হাতের অধর্ভুক্ত ঠোঙাটি মাটিতে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কহে, আবার?

একদিনের ভুল ভুলে যাও ভাই বউ।

সুবলের চোখ ছলছল করিয়া উঠে, দামিনীর পা ধরিতে যায়, সর্পস্পৃষ্টার মত দামিনী পিছাইয়া যায়, বলে, ছুঁয়ো না তুমি আমাকে।

চোখে তাহার আগুন জ্বলিয়া উঠে।

সুবল নত নেত্রে চলিয়া যায়।

দামিনী হাঁফ ছাড়ে, মনে বল পায়, অপরাধ যেন তাহার লঘু হইয়া গিয়াছে; কিন্তু উত্তেজনাটা কাটিয়া যাইতেই মন কেমন ম্লান হইয়া পড়ে।

সে বসিয়া ভাবে, ঠিক ভাবা নয়, কথাগুলা মনের মাঝে ঘোরা-ফেরা করে।

সুবলের যাওয়া-পথের পানে উদাস দৃষ্টিতে তাকায়, দেখা মেলে না ; মনে পড়ে, আমার আর সেথায় কে আছে, আমি তোমাদের সঙ্গেই এসেছি।

দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

অনেকক্ষণ পর গোষ্ঠ ফেরে, চোখ দুইটা লাল, হাত পা নাড়ে একটু বেশি, কথা কয় বেশি।

দামিনী বুঝিল, নেশা মিলিয়াছে।

গোষ্ঠ সোল্লাসে কয়, উঠাও তল্লি।

দামিনী মুখের পানে চায়, গোষ্ঠ বলে, ঘরদোর কাজকর্ম সব ঠিক। কলে কাজ, ফিটার-মিস্ত্রীর কাছে ; ছমাস পরে পঞ্চাশ ষাট দিয়ে পায়ে ধরবে লোকে। তার ওপর মহান্তকে পেলাম, ভালই হ'ল, গাঁয়ের লোক গাঁয়ে মায়ে সমান কথা, কি বল ? কই, গেল কোথা ? ওই যে ফিটার-বুড়োর সঙ্গে কথা কইছে। মহান্ত ও মহান্ত, এস এস, এই হেথা বউ রয়েছে।

আজ এই নিরাশ্রয়ের মাঝে আশ্রয়প্রাপ্তিতে মেজাজটা গোষ্ঠর দিলদরিয়া, ঈর্ষা-দ্বেষের কথা মনে জাগে না ; আর বিদেশে এই স্বদেশের অপ্রিয় জনটিও পরম প্রিয় আত্মীয় হইয়া উঠে।

গোষ্ঠ হাতছানি দিয়া সুবলকে ডাকে ; সুবল ভয়ে আগাইয়া আসে।

দামিনী ঘোমটা টানিয়া দিয়া তাহার পানে তাকায়, আবার সেই উগ্র দৃষ্টি, সুবলকে দেখিয়া আবার দামিনীর অন্তর বিরূপ হইয়া উঠে।

গোষ্ঠ আবার বলে, মহান্তও আর গাঁয়ে ফিরবে না গো, হেথা মুড়ি-মুড়কির দোকান করবে, তা বেশ হবে, কি বল ? তুমি মুড়ি ভেজে

দেবে, বানি পাবে; দুজনার রোজগার আমাদের ভাত ভুতে খাবে এইবার।

দামিনী মুখ ফিরাইয়া লয়।

মহান্ত, বউকে নিয়ে এস ভাই, ঘরটা আমি দেখে নিই, মাসে দু'টাকা ভাড়াই নেবে।—বলিয়া গোষ্ঠ আগাইয়া চলে।

দামিনীও গোষ্ঠর পিছন ধরিয়া চলে, সুবলের পানে ফিরিয়া চায় না পর্যন্ত; লাজুক লোকটি সঙ্গ ধরিতে সাহস করে না, তেমনই দাঁড়াইয়া থাকে।

অনেকক্ষণ পর বলে, যা চ'লে, ব'য়েই গেল; এবার ম'লেও চেয়ে দেখব না। আমিও মরব না, সব চেয়ে দেখব। কত হবে, এই তো কলির সন্ধ্যেবেলা।

কতক দূর গিয়া গোষ্ঠ পিছনে দামিনীকে দেখিয়া কহে, ওই!

কথার শব্দে ফিটার-বুড়ো চোখ ফিরায়, ঘোলাটে চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি; ছোট মিস্ত্রীর রক্তবর্ণ চোখের দৃষ্টি ধকধক করে।

দামিনী মুখ ফিরায়।

ফিটার-বুড়া চোখ ফিরাইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে; ছোট মিস্ত্রীর চোখ ফেরে না, গোষ্ঠর সম্মুখেও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, সঙ্কোচও নাই।

গোষ্ঠ কহে, মহান্ত কই?

জানি না। দামিনীর কথার সুরে সুরে একটা ঝাজ। উচ্ছৃঙ্খল আনন্দের একটা পিচ কাটিয়া ছোট মিস্ত্রী সোল্লাসে কহে, ভারী ঝাঁজালো বউ হে, বাঃ। চলিতে চলিতে মাথা নাড়িয়া যেন উপভোগ করিতে করিতে সে আবার কহে, ঝাঁজালো মেয়েলোকই ভাল হে; তা না প্যানপ্যান—চোখের কোণে নোনা পানি, দূর! ঝাড়ুমার, দু'চোখে দেখতে পারি না আমি।

দামিনীর পানে আবার সেই রক্তবর্ণ লোলুপ দৃষ্টি হানে।

দামিনীর ইচ্ছা করে, চোখ ছুইটি টিপিয়া গালিয়া দেয়।

বড় মিস্ত্রী শুধু বলে, আঃ!

ছোট মিস্ত্রী হি-হি করিয়া হাসে, বলে, বাবা মাছ সব পাখিতেই খায়, মাছরাঙাই ধরা পড়েছে, দোষ আমাদের—ঢাকু ঢাকু করি না, পেটেও যা, মুখেও তাই।

দামিনী থমকিয়া দাঁড়ায়।

গোষ্ঠ বলে, এস।

না, আমি যাব না।

কি? হ'ল কি?

আর কোথাও চল!

গোষ্ঠ বিষম চটিয়া কহে, ট্যাকে আমার ট্যাকশাল ঝমঝম করছে, আর কোথাও চল! ব্যাড়ব্যাড় করতে হবেনা, এস। ওদের কথাই অমনই।

ছোট মিস্ত্রী তবু হাসে।

মজুরের বস্তি, কুলী-হাট সব।

ছিটে-বেড়ায় ঘেরা, উলুখড়ের ছাউনি; ছোট ছোট ঘর, শুইলে এ দেওয়ালে মাথা ঠেকে, ওদিকের দেওয়ালে পা ঠেকে; দাঁড়াইলে চালে ঠেকে মাথা, একেবারে মাপা, যে লোক বেশি লম্বা, সে নাকি অনাসৃষ্টির সৃষ্টি, সৃষ্টিছাড়া।

এক এক আঙিনা ঘেরিয়া তিন-চারি ঘরের বাস; এক একজনের ছুটি কুঠরি, একটি বারান্দা, তাই ঘেরিয়া রান্না হয়।

উহারই ভাড়া মাসে ছ'টাকা; কলের মালিক মাস মাস বেতন হইতে কাটিয়া লয়।

এ আঙিনায় থাকে তিন জন, পূর্বদিকে ফিটার বুড়া, দক্ষিণের ভাগটায় ছোট মিস্ত্রী, পশ্চিমের খালি ভাগটা মিলিল দামিনী আর গোষ্ঠর অদৃষ্টে।

দামিনী কহে, এ যে অন্ধকূপ, আলো নাই, বাতাস নাই, ভিজে জ্যাবজ্যাব করছে।

এরই ভাড়া মাসে দু টাকা—বত্রিশ আনা—একশো আটাশ পয়সা। যেখানকার যা, শহরের এই বটে।

ঝাঁটা মার শহরের মুখে, এ যে বুকে চেপে ধরেছে!

তাও ভাল, ঘাড় তো ধরছে না কেউ।

ওপাশ হইতে ছোট মিস্ত্রী নেশার ঝোঁকে মাটিতে চাপড় মারিয়া কহে, কভি নেহি, কোইকো এক্তিয়ার নেহি হ্যায়।

গোছগাছ কর তুমি।

দামিনী সংসার পাতিতে বসে।

ঘরের মাঝে সে শুধু বসিয়া ভাবে, অভাব যে ষোল আনার—চাল, ডাল, জল, হাঁড়ি, কলসী, থালা, বাটি, সব কিছুরই।

শুধু সে খুঁটে বাঁধা সেই বালা দুইগাছা নাড়ে-চাড়ে আর কাঁদে।

ওপাশে গোষ্ঠ ছোট মিস্ত্রীর সঙ্গে বসিয়া গল্প করে, ওই সেই কথা। ছোট মিস্ত্রী বলে, মালিক কই নেহি।

উত্তেজনায় বাঙালী হিন্দী বাত ঝাড়ে।

গোষ্ঠ বলে, মালিক ভগবান!

নেহি, ভগমান কৌন হ্যায়, ভগমান রহনেসে দুনিয়াকা এইসা হাল হোতা, কেউ দুধে ভাতে খেত এ'টো পাত চাটত?

গোষ্ঠ চুপ করিয়া যায়, মন৹ যেন সায় দেয়, কিন্তু স্বীকার করিতে ভয় হয়, সংস্কার চোখ রাঙায়।

বস্তির প্রতিবেশীর দল আসিয়া জুটে, ফায়ারম্যান,রেলের পয়েণ্টস্‌ম্যান, জমাদার, পদস্থ কুলীর দল সব।

ছোট মিস্ত্রী পরিচয় করাইয়া দেয়, এ ফয়রমন, এ পাইণ্টমন, ই—

পয়েণ্টসম্যান গান ধরিয়া দেয়—

বৃন্দাবনের কিষণলাল মথুরার রাজা,
সেথায় খেতেন লঙ্কা ছাতু হেথায় খান গাঁজা।

ফায়ারম্যান ঢোলকটা পাড়িয়া ধমাধম বেতালা বাজনা জুড়িয়া দেয়।

আর একজন মাথায় হাত দিয়া নাচে।

এমনই তাণ্ডবের মাঝে পরিচয় হয়। গোষ্ঠর অন্তর কেমন কাঁপাইয়া উঠে। জমাদার চেঁচায়, এ বইঠ যাও, বইঠ যাও।

শেষে নৃত্যপর ব্যক্তিটির হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিয়া কহে, গাঁজা তৈয়ার করো।

পয়েণ্টসম্যান সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ করিয়া হাত পাতে, গাঁজা টিপিতে টিপিতে টেপার সঙ্গে জোর দিয়া কহে, সা-ত কা-ট, ন-য় টি-প, ত-বে হ-বে গাঁ-জা ঠিক।

ফায়ারম্যান এতক্ষণে গোষ্ঠর সঙ্গে আলাপ করে, বাড়ি কোথা ভাই?

সে অনেক দূর; খাটতে এসেছি খাটব, থাকব, বাস্।

তবু কি নাম গাঁয়ের?

সে কথা আর ছেড়ে দাও, সেথার সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে এসেছি আমি।

তবু—

এবার চটিয়া গোষ্ঠ কহে, বাড়ি আমার নাই।

ও বাবাঃ, চটছ কেন হে? আঃ, আঃ, উ কি করলি, কাট্, গাঁজাটা কাট্, তবে তো ঠিক হবে। তা নামটি কি তোমার?

গোষ্ঠ নামটা গোপন করিতে চায়, মনে মনে একটা নাম খোঁজে।

গাঁজার কলিকা চলে।

টানিতে টানিতে গোষ্ঠ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলে, কাঙালী, আমার নাম কাঙালী; হাম কাঙালী তো হ্যায়, হামারা নাম কাঙালী ঘোষ। বাড়ী হ্যায় নিশ্চিন্দিপুর—নিশ্চিন্দিপুর।—বলিয়া আপন মনেই হা-হা করিয়া হাসে।

ফায়ারম্যান বলে, সচ বাত নেহি হ্যায়; কাঙালীভি ঝুটা, নিশ্চিন্দিপুরভি ঝুটা।

পয়েন্টস্‌ম্যান বলে, ফেরারী নাকি হে?

খবরদার!—গোষ্ঠ মারিতে উঠে।

গাঁজার দম দিতে দিতে পয়েন্টস্‌ম্যান কহে, ঠারো, ঠারো, ইস্টিম হামকো লেনে দাও। আও, আব চলা আও।

ফায়ারম্যান হাততালি দিয়া উঠে, লাগে পালোয়ান লাগে।

মিস্ত্রী হাত ধরিয়া গোষ্ঠকে নামাইয়া লয়, ব'স ব'স, ভাই বেরাদারের সঙ্গে ঝগড়া করে না।

জমাদার বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ মান যাও ভাই, মান যাও।

ফায়ারম্যান দাঁত মেলিয়া হাসে, পয়েন্টস্‌ম্যানও হাসে, যেন কিছুই হয় নাই।

চীৎকার শুনিয়া দামিনী বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়।

ফায়ারম্যানের দৃষ্টি সে দিকে পড়ে, চোখ দুইটা জলজ্বল করিয়া উঠে, সে শুধু আঙ্গুল দেখাইয়া কহে, আরে!

জমাদার কহে, এ ভেইয়া, ই কাঁহাকা আমদানি?

একজন গান ধরিয়া দেয়, গোবর-বনে কোন্ কারণে ফুটল কমল' ফুল!

পয়েণ্টস্‌ম্যানটা চিত হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলে, জান গিয়া মেরা, জান গিয়া। কথাগুলা প্রায়ই সব একসঙ্গে উপরে উপরে পড়ে।

গোষ্ঠ আবার লাফাইয়া উঠে, পয়েণ্টস্‌ম্যানটাকে বিশেষ করিয়া শাসায়, জিভ ছিঁড়ে নেব।

ওদের ভয়ও হয় না, লজ্জাও হয় না, হি-হি করিয়া হাসে ; যুগান্তব্যাপী তমসার মাঝে ওই নির্লজ্জ হাসির কুৎসিত রূপ যে উহাদের চোখে কখনও পড়ে নাই।

পয়েণ্টস্‌ম্যান আবার বলে, এ তুমি খাঁটি কারও কপালে তেঁতুল গুলেছ বাবা।

গোষ্ঠ আর সেখানে দাঁড়ায় না, দামিনীকে টানিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবে। দামিনী নির্বাক।

তখনও ওদের কথা শোনা যাইতেছিল, পঞ্চাশ টাকা বাজি, ফেরারী না হয়তো কি বলেছি!

এত কোলাহলেও বাহির হয় না বড় মিস্ত্রী।

লোকটা যেন কেমন, কাজের শেষে ঘরে আসিয়া ঢুকে, আবার বাহির হয় কাজের সময়। বাঁধাধরা কাজ কয়টি ছাড়া আর যেন দুনিয়ায় কিছু নাই, লোহার মত শরীর, লোহা পেটা কাজ, যেন একটা যন্ত্র, ও যেন বস্তির অতীতের ধারা, বর্তমানকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া ক্ষীণ যোগসূত্রের মত পড়িয়া আছে।

তবু লোকটার মাঝে কি আছে, ওই নিস্পন্দতার মাঝখানে যেন বিপুল উদ্দাম কিছু আছে। দেখিলে ভয় হয়।

সহসা গোষ্ঠ কহে, নাঃ হেথা আর থাকব না।

দামিনী অকূল চিন্তার মাঝ হইতে কহে, কোথায় যাবে? যেন সে কূল পায় না।

গোষ্ঠও হতাশ হইয়া কহে, কোথায় বা যাব! সবারই গতিক যে ওই! রাস্তায়, ঘাটে, সবখানে, দেখলে না ভদ্দরলোকদের চাউনি?

নিরাশ্রয় দুইটি নরনারী ব্যাকুল অন্তরে অন্তর্দৃষ্টি হানিয়া একটা নিরুপদ্রব আশ্রয়ের জন্য বিশ্বসংসার খুঁজিয়া ফেরে।

হঠাৎ গোষ্ঠ আগুন হইয়া কহে, ফের যদি তুই বাইরে বেরুবি তো খুন ক'রে ফেলব বললাম।—বলিয়া সে দুয়ারটায় শিকল দিয়া বাহির হয়।

ঈষৎ ম্লান হাসি ক্ষীণ রেখায় দামিনীর অধরপ্রান্তে আসিয়া আবার মিলাইয়া যায়।

নিরুপায় ওই আশ্রয়টুকুই আঁকড়াইয়া ধরে।

আধার ভেদে আধেয়ের রূপ পাল্টাইয়া যায়।

এই দুইটি নরনারীর জীবনধারা যেন কাঁদনভরা করুণ কীর্তনের সুরে চলিতে চলিতে সহসা খেয়ালের সুরে চলিতে সুরু করিল।

অন্ধকার ঘরে দামিনী তাহা অনুভব করিল, কিন্তু গোষ্ঠর কোন ভ্রূক্ষেপ হইল না।

সে কলে খাটে, বয়লারে কয়লা ঠেলে, বাঁকানো হাঁটুর 'পরে কনুয়ের চাপ দিয়া হাতভরা কয়লা তোলে, আর বয়লারের অগ্নি-গহ্বরে ঝপাঝপ মারে, শেষ হইলে ঘড়াং করিয়া মুখের ঢাকনিটা বন্ধ করিয়া মাথায় জড়ানো গামছাটায় কপালের স্বেদ মুছে, পা দুইটি ছড়াইয়া বিড়ি টানে।

জ্বলন্ত আগুনের সঙ্গে লড়াই, ভ্রূক্ষেপও নাই, আক্ষেপও নাই।

গোষ্ঠ বলে, আমার বেশ লাগে।

গাঁজাটা যেদিন বেশী টানে, সেদিন বুকের তাণ্ডব যেন বাড়িয়া উঠে,

কহে, বহুৎ আচ্ছা, এইতো আগকে সাথ ফাগ খেলা রে ভাই। আমি দিই কয়লা, ও ছিটোয় আঁচ। মার ফাগ, হেঁই রে।

সে কয়লা মারে, হুহু করিয়া আগুনের আঁচ আগাইয়া আসে। গোষ্ঠর কৌতুক লাগে, সে হাসে।

ওই উত্তাপে সব যেন আগুন হইয়া উঠে, বক্ষে রক্ত, চক্ষে ধরা সরাখানার মতনই তুচ্ছ ঠেকে।

ওদিকে হাউজের ধারে মেয়েরা সব কাজ করে, স্টীম-পাইপের গোল হাতলটা ঘুরাইয়া হাউজের মুখে গরম ভাপ ছাড়িয়া দেয়। মেয়ের দল ছুটিয়া পালায়, উ উ বাবাঃ লো!

গোষ্ঠ হাসে, ছোট মিস্ত্রী হাসে।

মেয়েরা গালি দেয়, মর মুখপোড়া, উ কি আমোদ নাকি? উহাদের আমোদ বাড়ে।

কাজের শেষে কয়লায় কালো, আগুনে ঝলসানো দেহ, শুষ্ক বক্ষে মরু তৃষ্ণা লইয়া সে যখন মদের দোকানের পানে ছুটে, তখন সে যেন একটা অর্ধদগ্ধ শব, প্রেতত্ব লইয়া চিতা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

সমগ্র বিশ্বমানব-সভ্যতার ধারা এ মূর্তি দেখিয়া বোধ করি শিহরিয়া উঠে। এ যে তাহারই আর একটা অন্য দিকের রূপ।

ওই উন্মত্ত আচরণ বুঝি বিশ্বসভ্যতার কাহিনী কয়।

ওই সুপ্রকট কঙ্কালের মালার আখরে বুঝি তাহার ব্যর্থতার ইতিহাস লেখা।

সে কপট ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া ওই দৃশ্য দেখিতে বাঁচিয়া থাকে। কলের ঘরে তখন তহবিল মিল হয়, টাকা বাজে ঝমাঝম।

গোষ্ঠর মজুরি মিলে বারো আনা।

অর্ধেক তার নেশায় যায়, বাকী ছয় আনা দামিনীর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহে, ওই নে।

আর 'তুমি তোমার' নয়, এখন 'তুই তোর'; বুকে মুখে সবেই আগুন ধরিয়াছে, ভাষা পর্যন্ত ওই আগুনের আঁচেই বুঝি উগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যায় এ রূপ আরও বিকট ভয়াল হইয়া উঠে; এই শিক্ষা-দীক্ষাহীন মানুষগুলার বুকের নগ্ন পশুত্ব বিপুল তাণ্ডবে জাগিয়া উঠে; জাগে তো অবিরাম, কিন্তু অন্ধকারে বুঝি আবরণের স্থযোগ পায়; উন্মুক্ত আলোকে লজ্জা হয়। এতটুকু লজ্জার রেশ আজও আছে; ওইটুকুই বুকের মানুষটির অতি ক্ষীণ অবশেষের পরিচয় দেয়, ওই এতটুকুই আজও আছে যে।

ওপাশে বাউরীপাড়ায় সে কি কোলাহল! ঢোল বাজে এক তালে গান হয় অন্য তালে; একসঙ্গে চার-পাঁচজন গায়। রাখনা গায়, ইস্কাতনের টেকা রে প্রাণ রুপিতনের টেক্কা! নিতাই ধরে, বনের ফল খাও রে কানাই, ফল এনেছি চোখে চেখে। শশন ওরফে শশধরের আজ আধবাটি মদ পড়িয়া গিয়াছিল, সে সেই তখন হইতেই করুণ স্থরে গাহিতেছে, আধ বাটি মদ প'—ড়ে গে—ল আধ বাটি প—ড়ে গে—ল হায় গো! ওই তাহার গান, তাহার বিরাম নাই।

মেয়েরা রাস্তার ধারে বসিয়া জটলা পাকায়, পরনে এখন চওড়াপাড় মিহি শাড়ি, অল্প চুলে যোগান দিয়া খোঁপা বাঁধা, দীপ্তিহীন চক্ষে অন্ধকারের মাঝেও বক্ষের উদগ্র ক্ষুধা জ্বলজ্বল করে। কিন্তু ওই জ্বলজ্বলে চক্ষু শুধু তো মানুষের পথ পানে চায় না, চায় সে রজতের ঔজ্জ্বল্যের পানে। চক্ষে ওই জ্বলজ্বলে দৃষ্টির মাঝে শুধু বুকের ক্ষুধাই নাই, পেটের জ্বালায় ভোগের লিপ্সাও জ্বলে।

ওরা বলে, কত ভাগ্যে মনুষ্য জন্ম, পেটে খাব না, গায়ে পরব না তো করব কি ?

লক্ষ্য যে ওদের অন্ধকারে ঢাকা। ওদের পাপের ভয় শুধু দেবতার ঘরে উঠিতে, পূজা-করা ফুল পায়ে ঠেকিলে।

আর কোন পাপ ওদের মনে ছাপ মারে না ; জীবনের ধারার জন্ত দুঃখ নাই, অনুশোচনা নাই, আসলে পাপপুণ্য মানে না।

সাবি কপালে হাত বুলাইয়া বলে, উঃ কপালটা ফুলে উঠেছে ভাই, পাশের বাড়ির মেজো বউ—

মাইতুরী চিবাইয়া চিবাইয়া বলে, কার পায়ে মাথা ঠুকে লো ?

সাবি ঠোঁটের ডগায় তাচ্ছিল্যের পিচ কাটে। এত নেকন, বলে যে সেই পায়ে ধরতে পারলে সখি, ঘুঁটে কুড়োতে প'ড়ে থাকি !

তবে ?

ওই মুখপোড়া বুড়ো ভালুক খাতাঞ্চী লো।—বলিয়া হাসিয়া সারা, কৌতুকে কথা আর শেষ করিতে পারে না, ঠুই ক'রে ঢেলিয়ে দিলে আর চোখের সে কি ইসেরা, সূর্যিমামা ডুবুডুবু। আবার হি-হি হাসি।

তুই কি বললি ?—কৌতুকব্যগ্র প্রশ্ন হয়।

সন্ধ্যাবেলায় টাকা-ভরা বাক্সটা দেবে ? অমনই মুখখানা চুন, বিড়-বিড় করতে করতে চ'লে গেল !

পাড়ার ভিতর পাঁচীর ঘরে কোলাহল উঠে, জমাদার আর ফায়ার-ম্যানের গলা শোনা যায়।

খবরদার।

খবরদার !

সব ছুটিয়া যায় ; তখন যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, জমাদারের হাতে ঝাঁটা, ফায়ারম্যান একখানা বাঁখারি লইয়া, পরস্পরকে মারে।

সকলে হাততালি দেয়, হাসে। পাঁচী গালি দেয়, নেমে যা বলছি আমার ঘর থেকে, বাঁশমুখো, কালামুখো। 'কি বিপদ মা, ঝাঁটাগাছা সুদ্ধ নিয়েছে, দে তো ভাই পরী, ঝাঁটাগাছটা—

কে শুনিবে ?

পশ্চিম পাড়ায় উচ্চতর শ্রেণীর বাস, সেখানে আড্ডা বসে কোন দিন ছোট মিস্ত্রীর ঘরে, কোনদিন স্টেশনের ধারের সেই বটতলায়। গল্প করে বুড়ো ড্রাইভার ; খালি গা, পরনে চৌকোণা ঘরকাটা লুঙ্গি, গলায় কালো কারে বাঁধা রূপার তক্তি, বাহুতে একটা ; দক্ষিণ মণিবন্ধে শুধু কার চার ফের করিয়া বাঁধা ; প্রত্যেক পেশীটি সুপ্রকট, বুকখানা বোধ করি চল্লিশ-বিয়াল্লিশ ইঞ্চি।

দেখো ভাই, হামারা উমর হুয়া বহত, দেখা হায় বহত। কেতনা ধরমঘট হুয়া পহেলে, কেতো আদমী ভুঁখাসে মর গিয়া, দানা নেহি মিলা, পানি—শুধু পানি পিয়ে ধরমঘট চালায়া ; আখের মে হুয়া কি, কোইকো নোকরি গিয়া, কোইকো জেহেল হুয়া, যিসকো নোকরি নেহি গিয়া উসকা তলব কম হো গিয়া।

ছোট মিস্ত্রী বলে, সে তো বটেই, প্রথম যারা কষ্ট ক'রে গিয়েছে, তাদের দৌলতেই আজ যেটুকু হয়েছে।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে ফেলে সবাই। সে দীর্ঘশ্বাস বোধ করি অতীতের সহকর্মী নির্যাতীত বন্ধুদের প্রতি উহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ফায়ারম্যান বলে, আরে আজকাল তো বহুত সুবিধা, ধরমঘট বললেই হ'ল।

ছোট মিস্ত্রী বলে, হ্যাঁ, এখন আর—

কথার উপর কথা দিয়া গোষ্ঠ বলে, এখন আর তখন—এ তফাত বড় কিছু হয়নি ভাই। তখন ধমক দিয়ে কাজ সারত, আর এখন ফন্দি ক'রে—

ফন্দি-টন্দিতে বড় কিছু হবে না, আর সে গুড়ে বালি—

বালি দিলে ওরা জলে গুলে গুড়ের পানা ক'রে নিতে জানে। আচ্ছা, মুখে তো বল, হীরে আর জিরের দামের তফাত মানুষের করা—

আরে সে তো বটেই, জানের দামতো সবারই সমান। তবে সমান দামে আমরা বিকুতে পারি না, সে দোষ কার বলব?

নসিবের।

কে জানে। ছোট মিস্ত্রী বসিয়া ভাবে, কথাটা তাহার মনে ধরে না, দুর্বল রিক্ত মস্তিষ্কও ইহার সমাধান করিতে পারে না; তাহার পর সমস্ত সংস্কারের তমসায় আচ্ছন্ন, দৃষ্টি আর যায় না।

গোষ্ঠ বলে, দাদা রে, বুদ্ধি যার, বল তার, আর দুনিয়ার মালিক সে চিরদিন।

ড্রাইভার বলে, জরুর, বুদ্ধিকে মারে সব হোতা হায়। একদফে কেয়া হুয়া শুনো। হুয়া কি, এক দরখাস হামলোক দিয়া কি, দেশোয়াল ড্রাইবর, ফয়ারম্যানকো গ্রেড বাড় যায়, ডিপার্টমেণ্টকো সব কোইকো সাথ সমান হো যায়; নেহি তো হামলোক কাম ছোড় দেবে।

ধর্মঘট হ'ল তা হ'লে?

নেই হ'ল, দরখাসকে আচ্ছা হুকুম নেই হোনেসে হোবে এই ঠিক হ'ল। হাঁ, উসকে বাদ তিন ডিবিসনকে তিন ডি. টি. এস. বাহাল হ'ল, দরখাসকে হাল মালুম করনেকে লিয়ে।

হ্যাঁ, হ'ল তো ঘোড়ার ডিম?

না ভেইয়া, বহুত বাত আছে; হাঁ, হুয়া কি, ওহি তিন সাব লোক হুকুম দিয়া কি, সব ডিবিসনসে দেশোয়াল আদমীর তিন তিন সর্দার

হাবড়েমে ভেজ দেনা, হুঁয়া সাব লোকক্য সাথ বাত হোগা। হাঁ, দেশোয়াল লোক তো গেইলো, থাট কিলাসমে; ময়লে ওদের লুগা, বিড়ি পিতা, উ লোক জরুর থাট কিলাসমে যাবে। হাঁ, হাবড়েমে মুলাকাত তো হুয়া। দেশোয়াল লোক বোলা, সাব দেখো, ভুখামে ময় লোক মর যাতা, লুগা না মিলতা; মে-লোগনকা তিয়াষকো পানি না মিলি, দেশোয়াল মাটি পাথল তোরকে লাইন বানাতা, উসকে শিরমে লোহে গিরতা, কাঠ গিরতা, জান দেতা, আওর—; সাব বোলা, ই তো ঠিক বাত, জরুর তুমাহারা তলব বাড় যায়গা।

গোষ্ঠ বলে, বাস্ ওই ব'লে ভুল্কি দিয়ে চ'লে গেল।

নেহি, উস বখৎ টিফিনকা টায়েম হুয়া রহা, সাব বোলা, বহুত আচ্ছা টিফিনকো বাদ ইয়ে বাত হোগা, যাও বাবালোক, তুম লোগভি টিফিন করকে আও। সাব সব কইকো এক এক রূপেয়া দিহিস। টিফিনকে বাদ সাব পহিলে পুছা কি, তুম কেয়া খায়া কেতনেকো খায়া; কোই খায়া চার পয়সেকা সত্তু, এক পয়সেকা নিমক, পয়সে ভর মরচাই; কোই খায়া চার পয়সেকা চানা। লেকেন দো আনেকা জাস্তি কোই নেহি খায়া, আওর চৌদ্দা আনা কোই জেবমে, কোই লুগামে বাঁধ্ লিয়া। সাব বোলা, ময় কেতনোকা খায়া জানতা—চার রূপেয়া। ওহিমে বস্ সব মাটি হো গিয়া, তলব কুছ যাস্তি মিলা, লেকেন সমান না মিলা।

বাঃ রে! আমার মেহন্নত, তার দাম আমি পাব, সে পয়সা খরচ করি না করি আমার খুশি।

বেশি খেতে, ভাল খেতে কেউ জানে না, ভাল বাড়িতে থাকতে কেউ ভালবাসে না!

ওহি তো ভেইয়া, খায়া নেহি কাহে? রূপেয়া ভর খানেসে তো জরুর বহুত জাস্তি তলব মিল যাতা।

নেহি মিলতা, টাকা ভর খেলে কি বলত জান, বলত, যত পাবে ততই খাবে ; পয়সা তোমরা রাখতে জান না, দিয়ে কি হবে ?

আরে বাপু, এতদিন না খেয়ে যে পেট ম'রে আছে, আজ যে খেতে ভয় লাগে, হজম হবে না ; মনে যে হয়ই না, এমনই ভাল চিরদিনই খেতে পাব।

ভেইয়া, হুয়া তো লেকিন এহি ; আর ইয়ে হাল উলট যাগা কব, কৌন জানতা !

ছোট মিস্ত্রী কহে, আবার তোমরা বল—

বাত চলতা হ্যায়, মালুম হোতা ধরমঘট চলেগা, তামা—ম দেশোয়াল এক সাথমে কাম ছোড় দেগা। চার বাবু আয়াথা উ রোজ, মুশকিলকে বাত ইয়ে হ্যায় কি, গরিব আদমী তামাম, ধরমঘটকে বখত খানে নেহি মিলতা। বাবু লোক কুছ কুছ দেতা হ্যায়, হাম লোকক৷ তরফসে বাতভি করতা হ্যায় ; আওর কোই কোই ঘুষভি খা লেতা হ্যায়।

উ লোক জরুর ঘুষ খায়েগা ভাই ; বিনা গরজে ওরা এক পা হাঁটে না।

গোষ্ঠর মনে জাগে জমিদারের কথা, মহাজনের কথা সকলেরই মনে জাগে।

দোষ নাই ; যুগযুগান্তর যাহারা ইহাদের লুটিয়া খাইয়াছে, তাহাদের বিশ্বাস করিবার মত শক্তি ইহাদের নাই। কথাটা এত খোলাভাবে ইহারা বোঝে না, কিন্তু জন্মগত সংস্কার, অহি-নকুলের জন্মগত বিরোধের মত।

হঠাৎ ছোট মিস্ত্রী বলে, তোমরাও লাগাও, আমরাও লাগাব, ধর্মঘট করব, জরুর করব ; সারাদিন খেটে এক টাকা, বার আনা, আট আনা পয়সা, নেহি চলেগা। জরুর ধর্মঘট করব।

গোষ্ঠ কহে, মুশকিল ওই বাউরী বেটাদের নিয়ে ; কিছুতেই ঘামবে না, ওরা বলবে, বেশ চলছে, ভাই, কে হাঙ্গামা করে !

না করে তো মজা দেখাব।

রাত্রের কথা, রাত্রের অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে, না অভাবের তাড়নায় বুকের মাঝে কর্মের সময়ে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, কে জানে !

প্রভাতে আবার সব কাজে ছোটে।

সারাটা দিন আবার গা দিয়া ঘাম ঝরে, দুরন্ত রৌদ্রে দেহ তাতিয়া উঠে, আগুনের আঁচে ঝলসায়, বুকের রক্ত শুকায়।

কাজের শেষে, বেলা চারটায়, আবার অবসন্ন দেহে আসিয়া অফিসঘরে হাত পাতিয়া দাঁড়ায়।

খাজাঞ্চীর তবু অবকাশ হয় না, বলে, দাঁড়া রে বাপু, ঘোড়ায় চ'ড়ে এলি যে সব ! তিন পয়সা আর দুই পয়সা পাঁচ পয়সা—আরে গেল, এই চাপরাসী, ই লোককে ভাগা দেও তো।

অফিস ঘরের ঘড়িটা অবিরাম চলে টুকটাক টুকটাক ; সে হিসাব দেয়, দিনের এগারো ঘণ্টা, বার মিনিট, ছত্রিশ সেকেণ্ড গেল—

গোষ্ঠ বলে, চারটে বেজে বারো মিনিট, গোটা দিনটাই গেল—

ছোট মিস্ত্রী বলে, একটা দিন যায়, আর আমাদের পেরমাই যায় কদিন, তার হিসেব ও ঘড়িতে মিলবে না।

সত্য কথা, ইহাদের জীবনের যে কত ঘণ্টা গেল তাহার হিসাব ওই ঘড়িটা দিতে পারে না, সে গতিতে ছুটিতেও পারে না।

সেদিন তখন দশটা বাজে।

বয়লারের গর্ভে আগুন জ্বলে, উৎপাদিত বিপুল শক্তি গুমগুম শব্দ করে।

শ্রমিকের দল আপন আপন কাজে লাগিয়া যায়।

কলের ছোট-বড় চাকাগুলো ঘুরিতে শুরু করে, প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত—দ্রুততর।

দাঁতওয়ালা চাকাগুলা দাঁতে দাঁত মিলিয়া অবহেলে ওই বিরাট লোহার রাজ্য চালাইয়া চলিয়াছে, শ্রান্তি নাই, বিরক্তি নাই, অবসাদ নাই।

গোষ্ঠ বয়লারটার পানে তাকাইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে আপন মনেই বলে, ঠিক ওই ভুঁড়ে মালিকদের মত, দুনিয়াটা দাঁতে দাঁতে টেনে গিলেই চলেছে; অরুচি নাই, বিরাম নাই, অবিরাম।

একটা ছেলে আসিয়া কয়খানা কাগজ দিয়া যায়, গোষ্ঠ কহে, কি রে?

ছেলেটা সরিয়া যাইতে যাইতে কহে, চুপ। ম্যানেজার দেখতে পাবে, প'ড়ে দেখ না।

গোষ্ঠ কাগজটা পড়ে, শ্রমিক মিলিত হও।

গোষ্ঠ তাচ্ছিল্যভরে কাগজখানা বয়লারের মুখে ফেলিয়া দিল, সেখানা অগ্নিগর্ভ লৌহপুরীটার আঁচেই হইয়া গেল তামাটে, সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়াইয়াও গেল। এমন কাগজ প্রায়ই পাওয়া যায়, এই বাবুরা দেয়।

অন্য একজন ফায়ারম্যান কিন্তু সেটা মন দিয়া পড়ে।

এমন সময় সেখানে আসিয়া পড়িল মাদ্রাজী ম্যানেজার।

ম্যানেজার আসিয়াই কহে, সব ঠিক হ্যায় টিণ্ডাল?

হেড ফায়ারম্যান—টিণ্ডাল, সে সেলাম বাজাইয়া কহে, হাঁ হুজুর, সব ঠিক হ্যায়।

স্টীম কেতনা?—বলিয়া ম্যানেজার নিজেই উপরের মিটারটার পানে চাহিয়া দেখে।

সহসা ম্যানেজারের নজরে পড়ে ওই ফায়ারম্যানের হাতের কাগজ-খানা, উত্তপ্তকণ্ঠে সে কহে, উ কেয়া হায় ?

ফায়ারম্যানটি কহে, একঠো কাগজ হুজুর।

কেয়া লিখ্‌খা হায় উসমে, মিল তোড় দেও, স্ট্রাইক চালাও ?

নেহি হুজুর, এক সাথ মিলনেকো লিয়ে লিখ্‌খা হুয়া হায়।

হাঁ হাঁ, ওহি বাত হায়, ইউনিয়ন করনেকা লিয়ে লিখ্‌খা হায়। কোন্ দিয়া হায় ?

রাস্তামে মিল গিয়া হুজুর।

লায়ার, ঝুটা বাত, সচ কহো।

এবার সাহেব মাটিতে পা ঠোকে।

অগ্ন্যুত্তপ্ত শ্রমিক, তাহারও প্রাণে এ আঘাত সয় না, তাহার মনে হয়, ও লাথি মাটির বুকে তো নয়, উহাদেরই বুকে পড়িল। গোষ্ঠ গম্ভীর কণ্ঠে কহে, গালি মাত দেনা হুজুর।

ছোট মুখে বড় কথায় ম্যানেজারেরও মেজাজ গরম হইয়া উঠে, সে হাতের বেতটা সপাং করিয়া গোষ্ঠর পিঠে বসাইয়া চলিয়া যায়।

যাইতে যাইতে কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পকেট হইতে একটা টাকা গোষ্ঠের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার চলিয়া যায়, যাইবার সময় মোলায়েম সুরে বলিয়া যায়, ওইসিন কাগজ মিলনেসে বয়লারকো অন্দর ফেক দেনা, মগজ বিগড় যায়েগা।

বেতের জ্বালায়, অপমানের দাহে গোষ্ঠ গুম হইয়া বসিয়া থাকে। ওই বয়লারটার শব্দ যেন ওর আহত বুকের মাঝে বাজে ; ক্ষণপরে সহসা বয়লারটার ঢাকনিটা খুলিয়া, অপমানের দাম, ওই তাচ্ছিল্যভরে ছুঁড়িয়া দেওয়া টাকাটা বিরাট অগ্নিতাণ্ডবের ভিতর ফেলিয়া দেয়।

রূপাটা গলিয়া গলিয়া গড়াইয়া জ্বলন্ত কয়লার চাপের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া যায়, গোষ্ঠ একদৃষ্টে তাই দেখে।

টাকাটার ওই গতিতে তবু তাহার মনে সান্ত্বনা আসে।

মুক্ত দ্বারপথে বয়লারের আগুন যেন বিকট শব্দে বিশ্বগ্রাসে আগাইয়া অসিতে চায়।

রক্তচক্ষে গোষ্ঠ আপন মনেই কহে, পারবি? বাইরে এসে সারা সৃষ্টিটা অমনই ক'রে গলিয়ে ফেলতে পারবি? দূর দূর, লোহার ঢাকনিটাই ফাটাতে পারিস না, তা সৃষ্টি! মানুষের গোলাম তুই; আবার বলে, আগুন দেবতা।

অসম্ভব জোরে সে লোহার দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, মর্, ওরই ভেতর গুমরে গুমরে মর্।

অন্য সঙ্গী কয়টি তাহারই পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে, একটা সহানুভূতির দৃষ্টি সকলেরই চক্ষে, কিন্তু সান্ত্বনা দিবার ভাষা যেন পায় না। অক্ষমতার দোহাই দিয়া সান্ত্বনা দিতে মন বুঝি উহাদের আর উঠে না, গোষ্ঠ আপন মনেই বুকের উষ্ণ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া যায়, ঠিক আমাদেরই মত, বুকের আগুন বুকের মাঝে অমনই গুমগুম করে, বেরিয়ে আসতে পারে না।

এইবার টিণ্ডাল একটা কথা খুঁজিয়া পায়, কহে, আসবে রে; আসবে একদিন; বাবুরা বলে শুনিসনি?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে গোষ্ঠ বলে, হ্যাঁ, বেরুবে যেদিন, সেদিন আর এই হাড়পাঁজরাগুলো থাকবে না। আমাদের পোড়াতে আর আগুন লাগবে না, আর পোড়াবেই বা কে? টেনে ফেলে দেবে, মাটিতে হাড়গুলো মিশে যাবে, মাংস খাবে শেয়াল-শকুনে।

টিণ্ডাল সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলে, না, এর বিধান করতেই হবে।

গোষ্ঠ হাসে অবিশ্বাসের হাসি।

টিণ্ডাল বলে, চল্‌, আজ বাবুদের কাছে যাব। ওরা বলে, সভা করলেই এর উপায় হবে ; সব কেঁচো হয়ে যাবে।

অন্য একজন ফায়ারম্যান বলে, হ্যাঁ, ওদের কাছে যাবি, ওরা তোদের বুকের ওপর ব'সে খাবে, আমি দু-দুবার দেখেছি, আমাদের দিয়ে ধর্মঘট করালে, আর শেষে ওরাই ঘুষ খেয়ে আমাদের সর্বনাশ করলে। ও বাবা, সাপের দুটো মুখ, যেমন মালিক, তেমনই ওই বাবুরা।

টিণ্ডাল ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিয়া কহে, না না না, ওই যে শিবকালী আর সুরেনবাবু, ওই যে রে খদ্দর পরে, আমাদের পাড়ায় যায় মাঝে মাঝে, ওরা তা নয়। পাপী আদমীর চেহারাই আলাদা হয় রে, মহাত্মাজীর শিষ্য ওরা। এই ছোকরা এই!

ও পাশের কর্মরত ছোকরাটা এপাশ ওপাশ চাহিয়া দেখিয়া ছুটিয়া আসে। হেড ফায়ারম্যান বলে, যা তো, বড় মিস্ত্রী, ছোট মিস্ত্রী আর রামকিষণ—এদের ব'লে আয়, যেন টিফিনে সব এইখানে আসে, কাজ আছে, বাড়ি না যায়।

ছোকরাটা বলে, সায়েব যদি দেখে ?

টিণ্ডাল কলে দিবার তেলের চুঙ্গিটা ওর হাতে দিয়া কহে, এইটে হাত ক'রে যা।

ছোঁড়াটা চুঙ্গি হাতে চলিয়া যায়।

বারোটায় ভোঁ বাজে—টিফিনের ছুটির সিটি, সিটিটা আজ হয় অনাবশ্যক দীর্ঘ, আর ঘন ঘন ; ফায়ারম্যানগুলির মন যেমন উৎকণ্ঠিত-ভাবে বলে, সাথীরা আয় আয়। বয়লারের বাঁশীর সুরে তেমনই ভাষা উহারা ফুটাইতে চায়, মনে করে, এই অভিনবত্বের মাঝে আহ্বানের ইঙ্গিতটা সাথীরা বুঝিবে।

বড় মিস্ত্রী আসে, তেমনই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, যন্ত্রচালিতের মত ভাব। ছোট মিস্ত্রী আসে গান ধরিয়া, আর বাঁশী বাজাও না শ্যাম।

কি, সব খবর কি? কিছু পেয়েছিস নাকি, খাওয়াবি?

গোষ্ঠ বলে, ভাগ নিবি? এই দেখ।—বলিয়া পিঠটা খুলিয়া দেখায়, রক্তমুখী দড়ির মত দাগ। কথায়, চোখে তাহার ব্যথার জ্বালা ফুটিয়া বাহির হয়, যেন বয়লারের মুখের ঢাকনিটা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহার আঁচটা উহাদেরও উত্তপ্ত করিয়া তোলে।

বড় মিস্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে কহে, কে মেলে?

ছোট ম্যানেজার!

চল্, বড় সায়েবের কাছে যাব।

টিণ্ডাল বলে, হ্যাঁ, ওদের কাছে গিয়ে তো সব হবে, সব মুখ শোঁখাশুঁথি হয়ে যাবে, ও হবে না।

তবে?

আমি বলছিলাম, চল্, বাবুদের কাছে চল।

ছোট মিস্ত্রী ঘৃণার ভঙ্গীতে কহে, দূর, ওরা আমাদের চেয়েও ভেড়া।

হেড ফায়ারম্যান বলে, তবু ওরা আমাদের দিক তাকাবে, ওরাও চাকর, আমরাও চাকর, বুঝলি? আর যদি ঠকায়ই ওরা, তা হলে ওদের উপকার তো হবে।

অসহিষ্ণুভাবে ছোট মিস্ত্রী কহে, তা হবে না বাবা, ওসব আমি বুঝি না, যদি ঠকায় আমাদের, তবে জান্ নেব, স্পষ্ট কথা আমার; রাজি হয়, তবে আমরা ওদের কাছে যাব।

টিণ্ডাল বলে, না রে, শিবকালীবাবু, সুরেনবাবু ঠকাবার আদমী নয়, ওরা মহাত্মাজীর চেলা।

ছোট মিস্ত্রী বলে, বিশ্বাস আমি কাউকে করি নে, সে চেলাই হোক

আর ফেলাই হোক! আমাদের ভাতে মারে, আমরা হাতে মারব—এই বোঝাপড়া হয়, রাজি আছি।

তোর মনের দোষ, বুঝলি?

ঠ'কে আর ঠেকেই মানুষ শেখে; মুখ দেখে মন বোঝা যায় না, বুঝলি? বিশ্বাসের কাল নাই আর, যাকে বিশ্বাস করবি, সেই ঠকাবে; খাঁটি কথা। আর দোষ দিস আমার?

কথাটা সত্যই খাঁটী, দোষ কাহার?

বঞ্চিতের, না বঞ্চকের?

যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই ক্ষুধাতুরের দল শুধু যে স্বার্থেই বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, তাহা তো নয়; যে বিশ্বাস মানুষের জীবনের একটা পরম আশ্বাস—শান্তি, সেটুকুতেও দুনিয়া ইহাদের নিঃস্ব করিয়া তুলিয়াছে।

তাই এই রত্নভরা সারা বসুন্ধরা উহাদের চোখে আজ শুধু মেকী আর ফাঁকি ছাড়া কিছুই নয়।

যুগ-যুগান্তরের বঞ্চনায় আজ উহারা অন্তরে বাহিরে রিক্ত, হাহাকার আজ উহাদের বাণী।

বঞ্চনার ভয়ে ওরা ত্রস্ত।

অবিশ্বাস আজ উহাদের সংস্কার।

বড় মিস্ত্রী বলে, ওরে, এতটা অবিশ্বাস ভাল নয়!

উহার সংস্কারগত বিশ্বাস আজও মরে নাই। বড় মিস্ত্রী আবার বলে, দুনিয়াতে আর বিশ্বাস রইল না, এর পর বাপও আর ছেলেকে বিশ্বাস করবে না।

ছোট মিস্ত্রী বলে, করবে নাই তো, তোমাদের সে এক কাল গিয়েছে, লোকে বিশ্বাস ক'রে ঘরের কোণে লুকিয়ে টাকা ধার দিয়ে এসেছে; পাওনাদার ম'রে গিয়েছে, দেনাদার তার ওয়ারিশকে টাকা দিয়ে

এসেছে; আর আজ, ঘোর দেখি সারা বাজারটা, একটা লোক সত্যি কথা কয়? দোকানী দাম বলে চার ডবল, খদ্দের তাতেই রাজি, মতলব হচ্ছে তার ফাঁকি দেবার, মিথ্যে বই সারা বাজারটায় কিছুই নাই। আর আমরা, আমাদের গলা তো সবাই কাটে, মালিক কাটে, খাজাঞ্চী কাটে, দোকানী কাটে, তুমি আমার কাট, আমি তোমার কাটি। অবিশ্বাসের দোষ আছে?

বড় মিস্ত্রী ভাবে; সমস্ত শ্রোতার দলও নির্বাক হইয়া ভাবে।

হেড ফায়ারম্যান নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহে, তা বেশ তো, আমাদের ওদের সঙ্গে মিলে কাজ কি আছে, ওদের পরামর্শ নিতে তো দোষ নাই, ওদের একটু খাটিয়ে নে না।

বড় মিস্ত্রী বলে, সেই ভাল, চল, ওদের দুজনকে সন্ধ্যেতে আমাদের ওখানে যেতে ব'লে আসি। দল বাঁধিয়া সব বাবুদের বাসার দিকে যায়। শিবকালী কেরানী, আর সুরেন টাইপিস্ট।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স; শতকরা আশীজন বাঙালীর ছেলের মতই দুর্বল দেহ; কিন্তু চোখে স্বপ্ন, বুকে আশা। চোখ হইতে মাঝে মাঝে আগুনের ঝলকও বাহির হয়; সহকর্মীরা শিহরিয়া উঠে, কিন্তু আড়ালে ব্যঙ্গ করিয়া বলে, ভারত-উদ্ধারের দল।

সুরেন বলে, আমরাই তার ভিত্তি গেড়ে যাব। সুগভীর বিশ্বাস উহার বাক্যের প্রতি অক্ষরের মধ্যে রণরণ করিয়া বাজে, সে ঝঙ্কারে সহকর্মীদের ব্যঙ্গ মূক হইয়া যায়।

শিবকালী বলে, সে শুভ প্রভাতের আলোর রেশ আকাশে লেগেছে, আকাশ লালচে হয়ে উঠেছে। এত বড় দুর্দশা একটা এমনই বড় উন্নতির ইঙ্গিত নিশ্চয় করছে।

ওর কথার বেশ অর্থ হয় না, তবু সহকর্মীদের কেমন ভয় করে, অদূর-ভবিষ্যতে একটা জীবন-মরণের যুদ্ধের ছবি মনে জাগিয়া উঠে।

আবার বুকের এক কোণ হইতে লুপ্তপ্রায় একটা উত্তাপও যেন জাগিয়া উঠে, খানিকটা উত্তেজনাও যেন লাগে, তারাও ভারত-উদ্ধারের কথা কয়।

নাঃ, আর বেশি দেরি নাই।

একজন বৃদ্ধ কহে, তাও আমাদের নাতির আমলের আগে নয়।

দেশবন্ধু থাকলে কিন্তু আরও আগে হ'ত।

মহাত্মাই কি করেন দেখ।

খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠক একটি ছোকরা বলে, মহাত্মা কি হে, অর্ধ-উলঙ্গ রাজদ্রোহী ফকির বল।

থিয়েটারে হিরোয়িনের পার্ট করে রমেশ, সে ভাবাবেশে গান ধরে, আমরা ঘুচাবো মা তোর দৈন্য, আমরা ঘুচাব মা তোর ক্লেশ।

একজন বলে, আন্, ডুগি তবলা আন্, হারমোনিয়ম আন্, আসর পাত্, ভারত আর ভারত। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজে কাজ কি বাপু? ভারত উদ্ধার হ'লে তোদের কি রাজ্যলাভ হবে শুনি?

খবরের কাগজের পাঠক ছোকরা উষ্ণ হইয়া কহে, কি বললে, কিছু হবে না?

কি হবে শুনি? জিওগ্রাফিতে পড়নি ধনমণি যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না; কেমন, না একটি বলের উপর একটি পিপীলিকা ছাড়িয়া দিয়া উহাকে যেভাবেই ঘুরাও না কেন, পিপীলিকা তাহার গতি বুঝিতে পারে না। বাবা, আমরা হলাম পিপীলিকা।

স্বাধীনতা অধীনতায় কোন ভেদ নাই দাদা, কোন ভেদ নাই।

কলম পিষিয়া যাই, কলম পিষিয়া খাব।
বাঁশরী বাজাব শুয়ে যেমন বাজাই।

ইহার পর আর মতভেদ থাকে না, ওরা বাঁশীই বাজায়। স্বপ্নপ্রবণ তরুণ দুইটি তখন ঘরের মাঝে বসিয়া শ্রমিক-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার কর্মপন্থা ছকে।

শ্রমিকের সঙ্গে মিলিবার চেষ্টাও উহাদের ছিল, গোষ্ঠ এখানে আসিবার পূর্বে উহারা দুইজনে শ্রমিকের আড্ডায় যাইত; উহাদের মত হইয়া মিলিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু মিলিত না। উহারা যাইতেই গায়কের গান বন্ধ হইয়া যাইত, কিষণলাল ঢোলকটা পাশে সরাইয়া রাখিত।

সুরেন কহিত, রাখলে কেন, লাগাও, আমরাও শুনি।

উহাদের বিছানাতেই বসিয়া পড়িত, কিন্তু তাহাদের তাহাতে বিষম আপত্তি।

বড় মিস্ত্রী একখানা ময়ূর-আঁকা জাপানী মাদুর বিছাইয়া কহিত, ওখানে নয়, বাবু এখানে বসুন, এখানে বসুন।

ব্যবধান একটা থাকিয়াই যায়।

ফিরিবার পথে দুই বন্ধুতে তাই লইয়া আলোচনা হইত।

সুরেন কহিত, এ ব্যবধান আমাদেরই স্বখাত-সলিল। যাক, এ ব্যবধান পুড়িয়ে ফেলতে হবে। অসহিষ্ণু হ'লে চলবে না, দশ দিন, বিশ দিন, দু'মাস, ছ'মাস—একদিন ভুল ভাঙ্গতে বাধ্য। হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে, হতাশ হয়ে, অসহিষ্ণু হয়ে ফিরিয়ে নিলে চলবে না, একদিন ওরা সে হাত ধরবেই।

শিবকালী কহে, নিশ্চয়, এই যে একটা স্বাতন্ত্র্য, এই সে মিলনের সূচনা; দুনিয়াতে প্রত্যেক জিনিসেরই একটা প্রতিক্রিয়া আছে; বৈশাখের শুষ্ক নদী শ্রাবণের বন্যার পূর্বাভাষ।

হাদেরই এই আসা-যাওয়াটা কিন্তু শ্রমিকদের বেশি ভাল লাগিল না; সন্দিগ্ধ চক্ষে, অধঃপতিত মনে নানা কথা জাগিয়া উঠিল; ফলে এমন কুৎসা তাহারা রটাইল যে, সুরেন-শিবকালীকে যাওয়া-আসা বন্ধ করিতে হইল, কিন্তু রাগ করিল না।

সহকর্মীরা ইঙ্গিত করিল, বাবা, সিংকিং সিংকিং ওয়াটার ড্রিংকিং!

সেটা কিন্তু প্রত্যক্ষে নয়, পরোক্ষে।

সুরেন সে কথা শুনিয়া আগুন হইয়া উঠে; শিবকালী কিন্তু ফুৎকারে কথাটা উড়াইয়া দিতে চাহিয়া কয়, ডোণ্ট বি সেন্টিমেণ্টাল।

সে দিন শিবকালী আর সুরেন টিফিনে ছুটিতে মেসে বসিয়া ওই কথাই কহিতেছিল, ও ঘরে বাবুরা বসিয়া তামাক টানিতেছিল, এমন সময় শ্রমিকের দল আসিয়া সেলাম জানাইল।

শিবকালী আপনার ও সুরেনের বিছানা দুইটা টানিয়া পাতিয়া কহে, ব'স ব'স মিস্ত্রী ব'স সব।

বড় মিস্ত্রী জোড়হাত করিয়া কহে, মাপ করবেন বাবু, তেল-কালি-কয়লায় গায়ে একটা খোলস প'ড়ে গিয়েছে, বসলে বিছানাই মাটি হবে, আমরা এসেছি, একবার সন্ধ্যেবেলায় আমাদের ওখানে পায়ের ধূলো দিতে হবে।

সুরেন কহে, কি ব্যাপার হে মিস্ত্রী?

আজ্ঞে সেইখানেই বলব সব, যাবেন তা হ'লে, যেতে বলতে মুখ তো আমাদের নাই।

শিবকালী হাসিয়া কহে, সেজন্যে লজ্জিত হ'য়ো না মিস্ত্রী, পাঁচজনের মত তো সমান নয়, তাই পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়; তা যাব আমরা! তবে কি জন্যে যেতে হবে জানা থাকলে সুবিধে হ'ত।

ছোট মিস্ত্রী কহে, আমরা একটা সভা গড়তে চাই, তবে আপনারা শুধু গ'ড়ে দেবেন, আপনাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

শিবকালী ছোট মিস্ত্রীকে আবেগে আলিঙ্গন করে।

বড় মিস্ত্রী কহে, কালি লাগবে বাবু, কালি লাগবে।

শিবকালী কহে, মিস্ত্রী, কালি-লাগা জামাটা আমি রেখে দেব। এ কালি আমি মুছব না।

সুরেন কহে, আর আমাদের গায়ের কালি বড় মিস্ত্রী এ যে চামড়া না তুললে উঠবে না, কালিতে লজ্জাই বা কি, আর ক্ষতিই বা কি ?

ছোট মিস্ত্রী বলে, আমরা কিন্তু কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করব। সরল ব্যবহারে, ছোট মিস্ত্রীরও উহাদের বেশ ভাল লাগে।

সুরেন বলে, বেশ বেশ, বহুত আচ্ছা, খেতে আমি খুব ভালবাসি।

শিবকালী কহে, আর আমি বুঝি বাসি না, আমি বুঝি মার খেতে, গাল খেতে ভালবাসি ?

সকলে হাসিয়া উঠে, লঘু হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়া সকলে কেমন একটা সরল আত্মীয়তার সরল সমভূমিতে আসিয়া দাঁড়ায় ; ওই লঘু হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়াই বুঝি প্রথম আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়, ক্রমে সে গভীরতার মধ্য দিয়া সুদৃঢ় বিরাট হয়।

বীজ উপ্ত হয় স্বল্প মাটির নীচে, গাছ বড় হয়, তখন মূল চলিয়া যায় মাটির গভীরতা ভেদ করিয়া সুদূর অন্তরে--অন্তরতম প্রদেশে।

ওদিকে সিটি বাজে—কাজ, কাজ, কাজ।

শ্রমিকদের দল চলিয়া যায়।

হেড ফায়ারম্যান বলে, দেখলি কেমন লোক।

বুড়ো মিস্ত্রী বলে, ওরা বুকে ক'রে নিতে চায়, আমাদেরই বিশ্বাস হয় না, আর আমাদের বুকে কাঁটা আছে, সহও হয় না।

ছোট মিস্ত্রী বলে, পাড়াগাঁয়ের বাবু বোধ হয়; তাই এমন ধারা। পাড়াগাঁয়ের মুচীও গ্রামসুবাদে মামা হয়।

গোষ্ঠ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আজ তাহার গ্রামকে মনে পড়ে, রমাপতি মাস্টার, মুদী খুড়ো, যোগী কত্তা; সত্য, সেখানে অভাব থাক, নিদারুণ হতাশা থাক, তবু মমতা ছিল।

আবার আপন আপন কাজে লাগিয়া যায়।

ওই আগুনের সঙ্গে লড়াই করিতে মন আবার হালকা হইয়া উঠে। গোষ্ঠর মুখেও গান আসে, হাসি ফোটে।

এতক্ষণে সে হেড ফায়ারম্যানকে বলে, যাই বল বাপু, এও বেশ, খাই দাই কাম বাজাই, ধার কারুর ধারি না। আর এ কাম কি, একটা দৈত্যের সঙ্গে লড়াই!

কর্মের মাঝে একটা আনন্দ আছে আত্মপ্রসাদ আছে যে।

সেই দিনই সন্ধ্যায় শ্রমিকসঙ্ঘ গঠিত হইয়া যায়; বড় মিস্ত্রী, ছোট মিস্ত্রী, টিণ্ডাল, কিষণলাল, গোষ্ঠকে লইয়া এক পঞ্চায়েত গঠিত হয় উহাদের।

কত নূতন নিয়মকানুন হয়।

বেশ একটা আনন্দও পায়। কি যেন গভীরভাবে বুঝিবার চেষ্টা করে। বাবুরা বলে, মাটির বুক চিরে ফসল ফলায় কারা?

তোমরা!

আগুনের সঙ্গে লড়াই ক'রে কল চালায় কারা?

তোমরা।

মাটির ভেতর খনির অন্ধকূপে, সোনা রূপো হীরে জহরৎ খুঁড়ে বের করে কারা?

তোমরা

তোমরা হচ্ছ দুনিয়ার হাত, তোমরা দুনিয়ার মুখে আহার তুলে দাও, তবে দুনিয়া খায়।

কথাটায় মনের ভিতর উহাদের অহঙ্কার জাগে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের এত বড়, এত শক্তিমান ভাবিতে বুক কাঁপিয়া উঠে, নিজেকে যেন নিজের ভয় হয়।

বুড়ী সাবি বাউরিনী বলে, না বাপু, ও আবার কি কথা, আমরা গরিব মানুষ, গরিবের মত থাকব—না বাপু, ভয় লাগছে আমার।

সভার কাজ সারিয়া তরুণ দুইটিও ফেরে নীরব নিস্তব্ধ। তাহারাও ভাবে।

সহসা স্থরেন কহে, ওদের এখন চাই সেলফ-কন্‌শাসনেস্; আত্ম-বিস্মৃতি না টুটলে জাগরণ আসবে না; শিক্ষার ব্যবস্থা না হ'লে তা হবে না, নাইট ইস্কুল স্টার্ট করে ফেলা যাক।

শিবকালী বলে, এদের জন্যে তার প্রয়োজন নেই, সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। লঘু মেঘ, সে হল বাষ্প, তার মধ্যে শত সাধনাতেও বজ্রের সন্ধান পাবে না, কিন্তু ঝড় এসে তাদের মিলিত ক'রে দেয়, বর্ষণে বজ্রে ধরণী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে।

যুগ-যুগান্তরের উচ্ছৃঙ্খল শক্তি কিন্তু একদিনে সংযত হয় না, দূর-দূরান্তরের প্রবহমানা নদীর ঘূর্ণিভরা বন্যা সহসা বাঁধনে বাঁধা যায় না।

উহাদের আজন্মের উদ্দাম প্রকৃতি নিয়মের বাঁধন মানিতে চায় না। দল আবার ভাঙিতে শুরু করে, একদিনের কথার ঘায়ে জাগানো অনুভূতি ধীরে ধীরে সুপ্ত হইয়া পড়ে।

বাউরীর দল আগে ভাঙ্গিল।

একদিন উহারা আসিয়া কহিল, তোমাদের সঙ্গে আমরা আর নাই বাপু।

বড় মিস্ত্রী বলে, কি হ'ল কি, থাকবি না কেন শুনি?

মানতে হয় আমরা মালিককে মানব, তোমাদের কেন মানব? খেতে পরতে দাও তোমরা?

আরে, শোন্ শোন্, তোরাই সব পঞ্চায়েত হবি আয় না, আমরা ছেড়ে দিচ্ছি।

কে সে কথা শুনে, উহারা কিছুতেই মানে না, জবাব দিয়া চলিয়া যায়, তখন পাড়ায় উহাদের মহোৎসব চলিতেছে, মালিক-পক্ষ আজ মদের জন্ত করকরে দশ টাকা বকশিষ করিয়াছে।

সুরেন আবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু কিছু হয় না; ভাঙা দল আর জোড়া লাগে না।

শিবকালী কহিল, কেন মিছে চেষ্টা করছ সুরেন, চাপ না পড়লে ওরা এক হবে না; দেখেছ, আকাশে মেঘ আসে, চ'লে যায়, কিন্তু যেদিন বায়ুপ্রবাহ চাপ দেয় সেদিন বিচ্ছিন্ন মেঘমালা জমাট বেঁধে এগিয়ে আসে।

সুরেনও যাওয়া-আসা ছাড়িল।

আবার যা ছিল তাই; সেই নেশা, নাচ, গান, তাণ্ডব, কোনরূপে জীবনটাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া, জীবনের দিন কয়টাকে ক্ষয় করা।

হঠাৎ কাজের চাপ পড়ায় কোম্পানি শ্রমিকদের কাজের সময় সাময়িকভাবে এক ঘণ্টা বাড়াইয়া দিল, মজুরিও, বাড়িল, কিন্তু সে বাড়া অতি সামান্ত, বিশেষ সারাটা দিন পরিশ্রমের প্রচণ্ড ক্লান্তি, অবসাদের মধ্যে আরও এক ঘণ্টা পরিশ্রমের বিরক্তি—ক্লান্তির তুলনায় তাহার মূল্য নগণ্য, মজুরদের তাহাতে তৃপ্তি হইল না।

একটা অসন্তোষ, মনের মধ্যে সহিয়া যাওয়া পুঞ্জীভূত অসন্তোষের উপরে আসিয়া সে অসন্তোষকে নাড়া দিয়া যেন সজীব করিয়া তুলিল।

মদের দোকানে ভিড় বেশি জমিতে শুরু হইল; এই অবসাদ এই ক্লান্তি দূর করিতে, সারাদিনের আয়ুর দামে, আয়ুক্ষয়-করা বিষ উহারা আকণ্ঠ গিলিতে শুরু করিল।

গোষ্ঠ যেন মদে পাগল হইয়া উঠিল, কোনদিন মজুরির অর্ধেক যায়, কোনোদিন বা বারো আনার ষোল আনাই নেশায় চলিয়া যায়।

সেইদিন গোষ্ঠ শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিয়া ভাম হইয়া দাওয়ার উপর এলাইয়া পড়িল।

দামিনীর তখনও রান্না চাপে নাই, গোষ্ঠই রোজ ফিরিবার পথে বাজার করিয়া আনে, আজ তাহার শূন্য হাত আর নেশার অবস্থা দেখিয়া শঙ্কা হইল।

চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িল, আজ মনে হয়, শত দীনতা, শত নির্যাতনের মধ্যে সে ছোট গ্রামখানি, সে ছিল ভাল।

মনে পড়ে সাতু ঠাকুরঝিকে, এমন দিনে দুই মুঠা চালের অভাব সেখানে কোনদিন হইত না। এখানে লোকের নিজেরই কুলায় না, অপরকে দিবে কোথা হইতে?

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, খরচ—?

গোষ্ঠ মুখ বাঁকিয়া কহে, কেয়া খরচ, কিস্‌কে খরচ, খরচ হামরা নেহি হ্যায়, জমা কর্ লেও, সব জমা হোগা; সেরেফ হামকো খরচ লিখ্ দেও।

চোখ মুছিতে মুছিতে দামিনী গোষ্ঠর মুখে-চোখে জল দিয়া বাতাস করিয়া বলে, ওগো রান্না হবে কিসে, খরচ কই, খরচ?

দুই হাতেরই বুড়ো আঙুল দুইটা প্রবলভাবে নাড়িয়া গোষ্ঠ কহে ফক্কা, ফক্কা।

দামিনীর সারা অঙ্গ যেন হিম হইয়া যায়, উদরের মাঝে ক্ষুধার অগ্নিদাহ দাউ দাউ করিয়া জ্বলে, সে তো উপেক্ষার নয়, ক্ষুধার তাড়নায় জননী সন্তানের মাংসও খাইয়াছে ; সে উষ্মাভরে কহে, তারপর পেট— পেট চলবে কিসে ?

গোষ্ঠ হাত-পা ছুঁড়িয়া খুব উৎসাহের সহিত চেঁচায়, আগুন জ্বালাও, পেটমে আগুন জালাও।

দামিনী আর কথা কয় না ; ঘরের মেঝের উপর কাপড় বিছাইয়া শুইয়া পড়ে, পেটে তো নয় তাহার ইচ্ছা করে সংসার-জীবনে আগুন দিতে। ইচ্ছা করে, যাই মহান্তর কাছে। শুধু একটি মিষ্ট কথার অপেক্ষা ; ওই কথাটির দামে সে যাহা দিবে সে অনেক, এই স্বামীর ঘরে তাহা কল্পনার বস্তু।

দামিনী যায়ও ঘরের দুয়ার পর্যন্ত ; কিন্তু কেমন যেন আর পা উঠে না ; মনে পড়ে তার দৃষ্টির লোলুপতা !

সারা অঙ্গ তাহার ঘিন ঘিন করিয়া উঠে।

সে আবার ফিরিয়া আসিয়া শোয়।

উপবাসের অবসাদে দামিনী তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সারাটা দিন সে শুধু জলের উপর আছে, ওবেলা ঘরে যাহা ছিল তাহাতে গোষ্ঠর জলখাবারও পূরা হয় নাই।

তন্দ্রার ঘোরে সে স্বপ্ন দেখে, মহান্ত তাহাকে ডাকে, সম্মুখে তাহার— থালার উপর নানা উপচারে সাজানো নৈবেদ্য, পাশেই একখানি সুন্দর আসন পাতা, যেন সে বলে, এস, দেবীর মতই তোমায় পূজা করিব ! সহসা একটা প্রবল আকর্ষণে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া যায়।

মাতাল গোষ্ঠ তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া উঠাইয়া বসাইয়া দিয়া কহে, এই, ভাত দে—ভাত।

আগুনের দাহে নেশার বিষে এতক্ষণে তাহার উদরে বিশ্বগ্রাসী আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

দামিনী রুক্ষ দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চায়, স্বপ্নেও সুখ এ তাহাকে দিবে না?

বুভুক্ষু মদ্যপের কাছে এ নীরবতা অসহ্য বলিয়া বোধ হয়, গোষ্ঠ একটা চড় কষাইয়া কহে, নবাবের বেটি, হারামজাদী—

শরমস্তব্ধ নারীকণ্ঠ একবার অতর্কিতে ফুটিয়া আবার নীরব হইয়া যায়; শুধু চোখের জল বাঁধ মানে না।

সম্মুখেই ও ঘরে বসিয়া ছোট মিস্ত্রী ব্যাপারটা অনুভব করিয়া গোষ্ঠকে তিরস্কার করে, এই উল্লু, এই গোষ্ঠ, কি, হচ্ছে কি? মেয়ে-লোকের গায়ে হাত? খবরদার—

গোষ্ঠ ঘরের ভিতর হইতেই পড়িয়া পড়িয়া আস্ফালন করে, উঠিতে পারে না।

নারীকণ্ঠের চাপা-ক্রন্দনের আভাস তখনও পাওয়া যায়।

ছোট মিস্ত্রী আসিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারে; চোখে পড়ে দামিনী।

দামিনী বড় বাহির হইত না, ইহাদের এই লোলুপ দৃষ্টি যেন তাহাকে বিঁধিত। সামনের বারান্দায় গোষ্ঠ আবার একটা অবরোধ তুলিয়াছিল। দামিনীকে দেখিয়া ছোট মিস্ত্রীর দৃষ্টি আর ফিরিল না, লোলুপ উদগ্র ক্ষুধা তাহার মত্ত চোখে জ্বলজ্বল করে। অবরোধের মাঝে থাকিয়া দামিনীর রং আরও খুলিয়াছে, অশান্তি-অভাবের পীড়নে সে শীর্ণ হওয়ায় তাহাকে যেন লম্বা দেখায়, কিন্তু মানায় যেন বেশি, বেশ ছিপছিপে দীর্ঘ দেহ।

দামিনী মিস্ত্রীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিতে গেল, কিন্তু শতছিন্ন কাপড়খানার একপাশ টানিতে আর এক পাশ নগ্ন হইয়া পড়ে; সেদিকে দামিনীর ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সে মুখখানা ঢাকিল, কিন্তু অঙ্গের ওই একটা দিকের নগ্ন সৌন্দর্যেই মাতাল ছোট মিস্ত্রী উন্মত্ত হইয়া উঠে, সে হাত বাড়াইয়া দামিনীকে ডাকে, একটা পা ঘরের মধ্যেও আগাইয়া দেয়।

ভয়ে দামিনীর বুক কাঁপিয়া উঠে, সে ছুটিয়া গিয়া ওই জ্ঞানশূন্য স্বামীকে জড়াইয়া ডাকে, ওগো, ওগো, ওঠ গো, ওঠ।

ছোট মিস্ত্রী এবার পালায়, বলিতে বলিতে যায়, শালার ফাঁসি দিতে হয়, এমন পরিবারের গায়ে কাপড় না দিয়ে শালা মদ খায়।

দামিনী এবার উঠিয়া তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়। ওই মুহূর্তটুকুতে সে দেখে, আরও একজনের দৃষ্টি তাহারই উপর আবদ্ধ, সেই ঘোলাটে চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি।

দামিনীর আপন দেহের পরে ধিক্কার জন্মিয়া যায়।

সে ফিরিয়া গিয়া আবার শোয়।

আরও এক জোড়া দৃষ্টি তখন দামিনীর 'পরে আবদ্ধ ছিল। পিছনের ছোট ঘুলঘুলির মধ্য দিয়া পিপাসিত চক্ষু জাগিতেছিল সুবলের।

পান-বিড়ি, মুড়ি-মুড়কির দোকান ফেলিয়া সে দিনে দশবার সেথায় আসিয়া চোখ পাতিয়া থাকিত, বউকে একটি পলক দেখার জন্য।

স্টেশনের জমাদারকে কহিত, দেখো তো দাদা দোকানটা, আমি এলাম ব'লে, বিড়ি খাও ততক্ষণ।

ঘুলঘুলি তো নয়, যেন তমসার দ্বারপথ, অন্ধকার—সব অন্ধকার; দৃষ্টি শিহরিয়া উঠে, চোখের তারা শঙ্কা পায়, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুবল ফিরিয়া আসিত। আবার হয়তো ঘণ্টাখানেক পরে, বালতির জলটা

ফেলিয়া দিয়া আপন মনেই কহে, এঃ ময়লা কত! জল পালটে আনি, দোকানটা দেখো তো ভাই পানিপাঁড়ে।

পানিপাঁড়ে হাসিয়া কহে, এ জল ফেলে জল আনতে যাওয়া হে, বলি, কোন ঘাটে হে. এ পাড়া না নাম-পাড়া? বাউরিপাড়ার পানে আঙুল দেখায়।

সুবলও আর সে সুবল নাই, এই মুখর আবহাওয়ায় সে বেশ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, মুখ ফুটিয়াছে, ছলনায় আর বাধে না, সে কহে, ঘাটে নয় হে, কলের মুখে।

পিরীতি করবি, গোপনে করবি, তবে তো থাকবি সুখে, বেশ বেশ বেঁচে থাক কালাচাঁদ।

দেখ, এই দেখ, জলে পোকা দেখ।

জল-ফেলা জায়গায় কয়টা পিঁপড়ে নড়ে, সুবল তাহাই দেখায়। তারপর ত্বরিত পদে সে চলিয়া যায়।

আজিও এমনই একটি গোপন্ চোখ-পাতার অবসরে এই ঘটনাটি তাহার চোখে পড়িল; অন্ধকারের মাঝে দামিনীকে উজ্জ্বলভাবে দেখা না গেলেও দামিনীর আর্ত কণ্ঠ, গালিগালাজ, ছোট মিস্ত্রীর ওই কাপড়ের কথা সুবলের কানে গেল; তাহার অশ্রুমুখী দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল অনাহারক্লিষ্টা, শীর্ণা, অবসন্না, অশ্রুরুদ্ধ দামিনী, পরনে জীর্ণ বাস; লাজত্রস্তা নারী এ পাশ আবরণ করিতে ও পাশ নগ্ন হইয়া যায়। সে বুঝি মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া ধরিত্রী জননীর কোলে আশ্রয় চায়।

সুবলের আর জল লওয়া হইল না, সে ফিরিল।

কিছুক্ষণ পরেই সে একটা চাঙারি মাথায় করিয়া গোষ্ঠদের বাড়ি ঢুকিয়া হাঁকিল, কই হে, মোড়ল কই?

ছোট মিস্ত্রী দাওয়ায় বসিয়া কহে, কি হে দোকানী ?

এই ভাই একটা সিধে আছে, মোড়লের বাড়ী দিতে হবে ; অনেক দিন থেকেই মনে করছি, দোকান করলাম, মোড়ল গাঁয়ের লোক, একদিন খাওয়াব ; তা ভাই, আমার কে রাঁধে-বাড়ে, তাই সিধে দিয়েই সারি। কই, মোড়ল কই ?

বলিয়া সুবল গোষ্ঠর বারান্দায় উঠিয়া রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করে।

ধীরে ধীরে দুয়ারটা খুলিয়া দিয়া দামিনী সরিয়া দাঁড়ায়, সুবল সম্ভারপাত্রটি মেঝের উপর নামাইয়া দিয়া মৃদু কণ্ঠে কহে, এমন দিনে আমাকে একটা খবর দিলেও তো পার।

দামিনী উত্তর দিতে পারে না, কাঁদিয়া ফেলে।

দামিনীর চোখে জল দেখিয়া সুবলও কাঁদিয়া ফেলিয়া কহে, বউ ?— বলিয়া সে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে দামিনীর হাত দুইটি ধরিতে যায়, মুহূর্তে দামিনী হাত দুই পিছাইয়া গিয়া তাহার পানে তাকায়, সজল চোখে দামিনীও ঝলকিয়া যায়।

সুবল পলায়। গোষ্ঠর নাক ডাকে, যেন মরণ-ঘুম।

দামিনী ঘরে খিল দিয়া ওই আহার্যসম্ভারের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে।

ভোরে উঠিয়া গোষ্ঠ ক্ষুধার যাতনায় চারিদিকে চায়, দামিনী তখন ওপাশে ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

চোখে পড়ে সেই খাবারের চাঙারিটা।

গোষ্ঠ সেটা কাছে টানিয়া জলখাবারের আয়োজনটুকু গ্রোগ্রাসে গিলিতে থাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে পিছন ফিরিয়া সে দেখে, দামিনী তাহারই পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

গোষ্ঠ ধীরে ধীরে তাহার পানে ফিরিয়া আসিয়া লজ্জিতভাবে কহে, কাল কি তোমাকে মেরেছিলাম ?

দামিনী কথা কয় না।

গোষ্ঠ কহে, আমাকে মাপ কর, করবে না ?

দামিনী আবেগরুদ্ধ আব্দার-ভরা সুরে কহে, ওগুলো আর খেও না।

ওই গ্রোগ্রাসে গিলিয়া গোষ্ঠ কলের পানে ছুটে ; ভোরবেলা হইতেই ফায়ারম্যানের বয়লারে আগুন দিতে হয়, হাতলের পর হাতল ভরা কয়লা অগ্নিগহ্বরে নিক্ষেপ করে, দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলে, চিমনি দিয়া রাশি রাশি কালো ধোঁয়া প্রভাতের স্বর্ণ-আলোর পথ রোধ করিয়া সমস্ত স্থানটা ম্লান ছায়াচ্ছন্ন করিয়া তোলে।

বয়লারটা আপনার তেজে আপনি কাঁপে, গোঙায়—গুমগুম, গুমগুম।

সাতটায় সিটি পড়ে, ভোঁ—ভোঁ।

গোষ্ঠ হাসে আর বয়লারকে তারিফ করিয়া বলে, বাঃ বেটা, বাঃ বেশ বলছিস, ভোঁ—দৌড়।

কুলী-মজুরদের দল সিটির শব্দে কলের পানে ছুটে 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করিয়া, মুখের রবে কথাটা রটে না বটে, কিন্তু তাহাদের ওই ত্রস্ত ভঙ্গিমার গতিতে তাহা ফুটিয়া উঠে।

কল চলে। বয়লার গোঙায়, ইঞ্জিনের সঘন সুউচ্চ নির্মম শব্দ, স্টীমের ফোঁসানি, বেল্টিঙয়ের টানে বড় বড় চাকাগুলা অবিরাম ঘুরপাক খায় ; শব্দ হয় একটা অনুনাসিক ঘন—ঘন ঘং, ঘন—ঘন ঘং ; বিপুল বিচিত্র বিকট শব্দ।

মজুরেরা কাজে মাতে ; ওই শব্দরাজ্যে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে কিনা বোঝা যায় না ; যন্ত্রের মত কাজ করিয়া চলে ; ওই নির্মম বিরাট শব্দে একটা অনুরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।

ওই আবহাওয়ায় মানুষের বুকে হৃৎপিণ্ডের কোমল নৃত্য ক্রমশ কঠোর প্রবল হইয়া উঠে, ওই ইঞ্জিনটার সঙ্গে তাণ্ডবের তাল রাখিয়া ধকধক করিয়া চলিতে শুরু করে।

শ্বাস-প্রশ্বাস মুখ দিয়া হা-হা করিয়া পড়ে, যেন ঐ স্টীমের ফোঁসানির সঙ্গে সমতা রাখিতেই হইবে।

পেশীগুলা ওই যন্ত্রের মতই কঠিন হইয়া উঠে।

মানুষের অন্তর, ওই দাঁতওয়ালা চাকাগুলার মতই নির্মম, কঠোর হইয়া উঠে।

একটা ছোঁড়া আসিয়া হেড-ফায়ারম্যান টিণ্ডালকে কি ফিসফিস করিয়া বলিয়া যায়।

গোষ্ঠও ভুরু তুলিয়া ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে, কি ?

টিণ্ডাল বলে, শিবকালীবাবু এসেছিল বড় মিস্ত্রীর কাছে, বলছে যে আজ থেকে আর ওভারটাইম খাটব না।

গোষ্ঠ কহে, তারপর ?

না শোনে, ধর্মঘট হবে, বাউরী শালারাও রাজি হয়েছে, ব'লে গেল।

আবার ছোঁড়াটা আসে, বলে, সব ঠিক, সবাই রাজি হয়েছে। আর আজ রাত্তিরে বটগাছতলায় সভা হবে, ব'লে দিলে। সব ব'লে এলাম।

সবারই বুকে যেন একটা আনন্দ জাগিয়া উঠে।

দুনিয়াতে বড় কাজের একটা আনন্দ আছে ; শক্তিরও একটা আনন্দ আছে।

আজ পরস্পরের পানে তাকাইয়া উহারা মিষ্ট হাসি হাসে।

অতীতের ছোটখাটো মনোমালিন্যের কথা মনেই পড়ে না।

বেলা বারটায় আবার সিটি বাজে; টিফিনের ছুটি। সব দলে দলে বাড়ি পানে চলে, মৃদু গুঞ্জনে সবাই আজ ওই কথাই বলে।

গোষ্ঠ চলে সবার শেষে; ফায়ারম্যানদের তাই নিয়ম। ওদিকে অগ্নিগর্ভ বয়লারটা শুধু ফোঁসায়।

দামিনী সেদিন শুইয়াই ছিল। আগের দিন উপবাসে গিয়াছে, এঁটো-কাটা নাই; বাসন মাজা নাই; আর ঘরেও আপনার বলিতে কিছু নাই, যাহা দিয়া নূতন করিয়া উনান জ্বালে। যাহা আছে, তাহা সুবলের দেওয়া, কিন্তু সে স্পর্শ করিতে মন চাহিতেছিল না; বিশেষ করিয়া গোষ্ঠর সেই নির্লজ্জ খাওয়াটায় পেটের জ্বালার উপর তাহার ঘৃণার অন্ত ছিল না।

এক-একবার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল আত্মহত্যার প্রয়াস; আবার মনে হইতেছিল, ওই উপচারে পরিপাটি করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া খায়, সুবলকে ডাকিয়া পাঠায়, তাহার মুগ্ধ নয়নের আরতিতে সে নববধূর মত হইয়া উঠে।

পরক্ষণেই মনে জাগে দারুণ ঘৃণা নিজের দেহের উপর, অক্ষম নির্লজ্জ স্বামীর উপর, দুনিয়ার ক্ষুধার উপর, সমস্তগুলার বীভৎসতা তাহাকে অতি কঠোরভাবে পীড়া দেয়। দীর্ঘ দিনের উপবাসে ক্ষুধা তাহার ছিল না; কাজেই ওই আহার্যগুলার প্রতি কোন আকর্ষণও তাহার কাছে ছিল না; ছিল শুধু দুর্বল চিত্তে অর্থশূন্য চিন্তা।

সহসা পিছনের সেই ছোট জানালাটায় একটা শব্দ হয়, খস—স খস—স।

দামিনী চমকিয়া সেদিকে চায় ; দেখে, শিকের ফাঁক দিয়া একখানা কাপড় আগাইয়া আসে ; চওড়া খয়ের-পাড় শাড়ি একখানা।

দামিনী খয়ের-পাড় শাড়ি পরিতে ভালবাসিত।

দামিনীর বুকে একটা লঘু চকিত ভাব জাগিয়া উঠে ; বক্ষস্পন্দন অকারণে দ্রুত হইয়া উঠে, সে এ-পাশ ও-পাশ তাকায়, মনে হয়, ওই অন্ধকার কোণে দাঁড়াইয়া কে বুঝি দেখিতেছে !

সে বুঝিতে পারে কাপড়খানার ওপারে কে, তাহার মনের রুচিটি এমন নিখুঁতভাবে জানে কে। তাহার মনে পড়ে কোন্ গাছটির আম সে বেশি ভালবাসিত, কোন্ ফুলে তাহার রুচি বেশি, সে জানে কে। দামিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, শব্দ করিতে শঙ্কা হয়, কে হয়তো আড়ি পাতিয়া আছে।

একবার সে কোমল মনোহর বসনখানার পানে তাকায়, আর একবার আপন অঙ্গের ওই শীর্ণ ছিন্ন মলিন বসনখানার পানে।

সহসা আপন মনেই দুইটা আঙুল দিয়া নিজের পরণের কাপড়খানা ঘষে ; জীর্ণ, অতি কর্কশ কাপড়খানা ; আঙুল দুইটার ডগা জ্বলিয়া উঠে, কাপড়খানা ছিঁড়িয়া যায়।

তাহার চক্ষে একটা বিচিত্র জ্বলজ্বলে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে, সারা অঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠে।

একটা লঘু কোমল শব্দ হয়, কাপড়খানা ঘরের মেঝের উপর আসিয়া পড়িল। ওই লঘু শব্দেই দামিনী চমকিয়া উঠিল।

কাপড়খানার অন্তরাল হইতেই জানালাটার ওপাশে একখানা মুখ চকিতে দেখা যায় ; পরমুহূর্তেই সে সরিয়া গিয়াছে।

দামিনীর অনুমান মিথ্যা নয়, সে সুবলই।

দামিনী বসিয়া বসিয়া ভাবে আর আঙুল দিয়া কাপড়খানা ঘষে।

কোমল, মসৃণ। ধীরে ধীরে সে কাপড়খানা আপন হাতের বাইরের উপর ঘষে, কাপড়খানার কোমলতায় একটা মধুর অনুভূতি আসে; আর ওই দামিনীর শখের পাড়খানি, সুন্দর, চোখ জুড়াইয়া যায়।

দোষ কি?

কতজনের কথা মনে পড়ে; শত শত দৃষ্টান্ত তাহার মনে আসিয়া জাগে।

ওই ছোটলোকপাড়ার উহারা!

উহাদের নয় এই স্বভাব; কিন্তু এই সৎ-জাতি, ইহাদের মাঝেও তো অভাব নাই। ওই খেঁদীর অঙ্গে পয়েন্টসম্যানের দেওয়া উপহারের অন্ত নাই; সে কথা জানেও তো সকলে, খেঁদীও তো গোপন করে না, তাহার তো ইহাতে লজ্জা নাই, সে তো প্রকাশ্যেই বলে, সগ্‌গে আমার কাজ নাই ভাই, সেথায় না হয় তোরাই যাবি; হেথায় তো খেয়ে প'রে বাঁচি।

খেঁদীর নয় রক্ষক নাই, কিন্তু ওই দাসী? তাহার তো স্বামী আছে —ওই হাঁপানী-রুগী বাবুলাল; তবুও তো হাজারিবাবুর পয়সা নেয় সে। সে বলে, সতীগিরি ফলাতে গেলে তো স্বামীকে শুকিয়ে মরতে হবে; তা এতে যদি ও-ও বাঁচে, আমিও বাঁচি, সেই আমার ভাল।

চিন্তায় চিন্তায় মন আজ মুখর হইয়া উঠে, সে বলে, আর ওই যে মানুষটি, যে আমার জন্য সব ত্যাগ করিয়া হেথায় পড়িয়া আছে, না বলিতে না জানাইতে অপরাধীর মত গোপনে সব জানিয়া, গোপনে গোপনে যত পূজা যোগাইয়া যায়, তাহার পানে চাহিবার কি কোন অধিকার নাই?

দামিনী কাপড়খানা তুলিয়া লয়।

কিন্তু কেমন একটা অস্থিরতা বুকের মাঝে জাগিয়া উঠে, হৃৎপিণ্ডটা বুকের মাঝে ধকধক করে, বাহির হইতেও যেন সে শব্দ শোনা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা মুখও তাহার বুকের মাঝে জাগিয়া উঠে; দুঃখী স্বামীর ম্লান মুখখানি, তাহার দিকে অতি নির্ভরশীল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, সে তাহাকে সামগ্রীসম্ভারের উপহারে সুখ দিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার বুকের একবিন্দুও তো দিতে বাকি রাখে নাই!

বাহির দরজা খোলার শব্দ হয়; দামিনী চমকিয়া কাপড়খানা তাড়াতাড়ি একটা শূন্য হাঁড়ির গর্ভে লুকায়।

ও বউ, কাপড় এনেছি, কাপড়।

দামিনী চমকিয়া দরজায় খিল বন্ধ করিতে যায়, কিন্তু তাহার পূর্বেই ভেজানো দুয়ার খুলিয়া, ছোট মিস্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসে, হাতে তাহার একজোড়া শাড়ি। দামিনী পাশের দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়ায়, যেন ওই দেওয়ালের মাঝে গিয়া লুকাইতে চায়, সর্ব শরীর থরথর করিয়া কাঁপে।

কাপড়খানা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া ছোট মিস্ত্রী বেশ নরমভাবেই কহে, দেখ, পাড়ের কি বাহার! জানিতে পারিবে করিলে ব্যবহার—বলিয়া সে ফ্যা ফ্যা করিয়া হাসে।

কুৎসিত বীভৎস হাসি, কুৎসিত ইঙ্গিত করে, ইঙ্গিতে যেন দেনা পাওনার পূর্ণ স্বরূপ প্রকট হইয়া উঠে, সে অতি বীভৎস, অতি ভীষণ।

মানসনেত্রে সুবলের সলাজ মুখখানাও অমনই বীভৎস ভীষণ হইয়া উঠে।

সারা অঙ্গ তাহার যেন মোচড় দিয়া উঠে, কণ্ঠে তাহার স্বর ফুটে না, কিন্তু আর সে সহিতেও পারে না; সে সর্ব শক্তি একত্রিত করিয়া দুয়ারটা দড়াম করিয়া মিস্ত্রীর মুখের উপরই বন্ধ করিয়া দিয়া হাঁফায়। ওপাশে মিস্ত্রীর গলা শোনা যায়।

ভয় কি মাইরি, তুমি হুকুম কর, সোনায় অঙ্গ মুড়ে দোব, আর ও শালাকে—বল তো আজই ওকে তাড়াই।

উত্তর কেহ দেয় না ; ছোট মিস্ত্রী আপন মনে গান করিতে করিতে আপন ঘরে চলিয়া যায়, দরজা খোলার শব্দ পাওয়া যায়।

দামিনীর আর লজ্জার আত্মগ্লানির পরিসীমা থাকে না, অশিক্ষিতা সে, সুস্পষ্ট কথার যুক্তি তাহার মনে জাগে না, কিন্তু নারী, নারীত্বের অপমানবোধ তাহার জন্মগত সংস্কার, সে বোধ তাহার আছে ; প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া সুবলের কাপড়খানা বুকে করিয়া আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তর যেন পুড়িয়া যায়, আর ওই পশুটা তাহাকে যে নগ্ন বীভৎস অপমান করিয়া গেল, তাহার জন্য ক্ষোভ আর লজ্জার তাহার অন্ত ছিল না। দামিনী মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে।

বাক্যহারা মন তাহার তখন বলিতেছিল, মা ধরণী, দ্বিধা হও মা। মাটির দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি বুঝি দ্বিধাবিভক্ত মৃত্তিকার অন্তরালে ধরণীমায়ের বিস্তৃত কোলের প্রতীক্ষায় ছিল ; কিন্তু নিশ্চলা অকরুণ ধরণী দ্বিধা হয় না ; বোধ করি শক্তিমত্ত সন্তানগুলার দম্ভের পদাঘাতে সে আজ বেদনায় মূর্চ্ছিতা, চৈতন্যহীনা।

মৃদু বায়ু-প্রবাহে সহসা তাহার নাকে আসে ওই নতুন কাপড়ের গন্ধটা, সে মুখ তুলিয়া তাকায়।

অশ্রুরুদ্ধ ঝাপসা দৃষ্টির সম্মুখে ওই রক্ত-রাঙা পাড়খানা মনে হয় যেন নাগপাশ, যেন অন্তহীন বেষ্টনে দামিনীকে বাঁধিতে আসে ; আর হাঁড়িটার ভিতরে খয়রা রঙের কাপড়খানা যেন বিবরের নাগের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে।

দামিনীর দম বন্ধ হইয়া আসে যেন, সত্যই সে আপন দেহের সর্বাঙ্গে একটা কঠিন বন্ধনাবেষ্টনী অনুভব করে ; তাহার চোখ দুইটা কেমন বড় হইয়া উঠে।

সে উন্মাদের মত এ বন্ধন-মুক্তির উপায় খোঁজে, চোখে পড়ে তাহার কুলুঙ্গির 'পরে দেশলাইটা।

দামিনী ব্যগ্র বাহুপ্রসারণে দেশালাইটা চাপিয়া ধরে ; যেন উল্কামুখ গরুড় সে।

ও-পাশ হইতে কেরোসিনের ডিবাটা টানিয়া আনে।

একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধ !

সে গন্ধে ছোট মিস্ত্রী বাহিরে ছুটিয়া আসে ; চোখে পড়ে দামিনীর রুদ্ধ দ্বারের সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়া অনর্গল ধূমশিখা বাহির হইতেছে।

সে নিশ্চলভাবে আপন বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখে, চোখ দুইটা বিস্ফারিত, চীৎকার করিতে কণ্ঠ ফুটে না।

মনে হয়, ওই রাঙা-পাড় কাপড়খানা সূতায় বোনা ছিল না, আগুনের শিখায় বোনা ছিল ; সেই আগুন ওই ঘরের মাঝে সমস্ত গ্রাস করিয়া লেলিহান শিখায় জ্বলিতেছে।

সে আগুন যেন সমস্ত গ্রাস করিবে, তাহার উত্তাপও যেন সে অনুভব করে, সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠে ; ভয়ার্ত হইয়া মিস্ত্রী পলাইয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরেই গোষ্ঠ আসে টিফিনের ছুটিতে জল খাইতে, হাতে একটা খাবারের ঠোঙা ; গত রাত্রের ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করিয়া দামিনীর জন্যই খাবারটা আনিতেছিল, ভোরেবেলা সেই খাবারগুলা খাইয়া তাহার নিজের বেশ ক্ষুধা ছিল না। কি বলিয়া দামিনীর কাছে মাফ চাহিবে তাহার কত কথাও মনে জাগিতেছিল।

বাড়িতে ঢুকিয়াই ওই বিশ্রী গন্ধে সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারিপাশে চায়, দেখে তাহারই রুদ্ধ দুয়ারের ফাঁক দিয়া অনর্গল কালো ধোঁয়ার রাশি।

খাবারের ঠোঙা ফেলিয়া সে ছুটিয়া আর্তকণ্ঠে ডাকে, ওগো! ওগো!

কেহ সাড়া দেয় না, গোষ্ঠ উন্মত্তের মত দুয়ারে ধাক্কা মারে, উন্মত্ত ধাক্কায় দরজাখানা ভাঙিয়া পড়ে।

ধূমকুণ্ডলীর মাঝে দামিনী নিশ্চল দাঁড়াইয়া, দৃষ্টি তাহার স্থিরভাবে নিবদ্ধ, সম্মুখে চরণপ্রান্তে ধূমোদ্গারী এক অগ্নিস্তূপের উপর ছোট ছোট শিখাগুলি যেন তাহার আরতি করিতেছে, অগ্নিশিখার আভায় দীপ্ত মূর্তিখানি যেন ওই অগ্নিশিখায় স্নান করিয়া উঠিয়াছে।

গোষ্ঠ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে একটা কাপড়ের স্তূপ জ্বলিতেছে, আরও জ্বলিতেছে আহার্য-সামগ্রী।

গোষ্ঠ ব্যস্ত হইয়া কহে, এ কি, কাপড় পুড়ছে যে!

সে একটা পাত্র লইয়া জল আনিতে ছুটে, কিন্তু দামিনী তাহার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া বলে, না।

গোষ্ঠ বলে, সে কি?

হ্যাঁ, তুমি তো দাও নাই।

গোষ্ঠ দামিনীর পানে চায়, কথাগুলার সূত্র যেন সে পাইয়াছে অনুভব করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ হয় না।

দামিনী সহসা গোষ্ঠর পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাঁদে।

গোষ্ঠ তাহার হাত ধরিয়া তোলে, অশ্রুমুখী নারী তাহার দুইটি হাত ধরিয়া কাতর কণ্ঠে কহে, ওগো, পরতে কাপড় আর খেতে ভাত তুমি আমায় দিও গো।

গোষ্ঠ দামিনীর অঙ্গপানে চায়।

ছিন্নবাসা নারীর লজ্জা আজ অতি করুণভাবে সুপ্রকট হইয়া চোখের উপর ফুটিয়া উঠে।

দগ্ধ কাপড়ের গাদার পানে আঙুল দেখাইয়া গোষ্ঠ পরুষ কণ্ঠে কহে, কে, দিলে কে ?

ওই অজ্ঞাত হস্তের বস্ত্রদানের অন্তরালে সে বস্ত্র-হরণের প্রয়াস দেখিতে পায়।

তা আমি জানি না গো, ওই জানালা দিয়ে—। গোষ্ঠর মূর্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল ; অজ্ঞাতে একটা গোপনতার প্রয়াস তাহার ভীত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

তাই পুড়িয়ে দিলে ?

হ্যাঁ।

গোষ্ঠ যেন নিশ্চল পাষাণ হইয়া গেল, তাহার অন্তর-পুরুষ তাহাকে নিদারুণ ধিক্কারে মূক করিয়া দিল।

লজ্জার গ্লানির আর পরিসীমা থাকে না, তাহার সে লজ্জা, সে ধিক্কার দ্যূতসভায় যাজ্ঞসেনীর বসনাকর্ষণে নিশ্চল অক্ষম পাণ্ডবদের চেয়ে বোধ করি কম নয়।

সে বসিয়া ভাবে কত কি।

কে সে দুঃশাসন ?

আক্রোশ গিয়া পড়ে সুবলের উপর, তাহার মন বলে, এ সেই। গোষ্ঠ ঝাড়া দিয়া উঠে, তাহার ভঙ্গিমার মাঝে প্রতিহিংসার ভয়াল রূপ সুপ্রকট হইয়া উঠে।

দামিনী তাহার হাত ধরিয়া কহে, কোথা যাচ্ছ ?

খুন করব শালা মহান্তকে।

দামিনী শিহরিয়া কহে, সে নয়, না না, তুমি যেওনা।—বলিয়া সে স্বামীকে দুই হাতে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিল।

গোষ্ঠ তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহে, কে তবে ?

দামিনী কাতর কণ্ঠে কহে, ওগো আগে নিজের দোষ ভাব, তুমি আমায় দিলে, ভালবাসলে কার সাধ্যি যে—

ক্ষোভে, ক্রোধে, অভিমানে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়, চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর করিয়া অশ্রুর বন্যা বহিয়া যায়।

গোষ্ঠও আর ঠিক থাকিতে পারে না, নিদারুণ দুঃখে, লজ্জায় দামিনীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদে।

স্বামীর অশ্রুতে দামিনীর নারীহৃদয় গলিয়া যায়, বেশ আবদার ভরা সহজ কণ্ঠে কহে, তুমি থাকতে আমার দুঃখ কি, আমার অভাব কিসের? নাও, ছাড়, জল খেতে দি।

গোষ্ঠ স্ত্রীকে ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু সে এমন সহজ হইতে পারে না; অক্ষমতার আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তর-পুরুষ পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। দাওয়ায় আসিয়া বসিয়া ভাবে, কে সে দুঃশাসন?

দামিনী ঠিক বলিয়াছে, তাহার অক্ষমতা, ওই অভাব, ওই নির্মম কদর্য অভাবই সেই দুঃশাসন।

অভাবের উপায় খুঁজে সে।

উপায় মিলে না, নিরুপায় ক্ষোভে সে বলিয়া উঠে, এর চেয়ে মরণ বড় আমার।

ভাল মিস্ত্রী আসিয়া বাড়ি ঢুকিল, গন্ধটার রেশ তখনও যায় নাই, বুড়া নাক সিঁটকাইয়া বলিয়া উঠে, উঃ, কি পুড়ছে?

কেহ কথার উত্তর দিল না, বুড়া ধীরে ধীরে আসিয়া গোষ্ঠের কাছে দাঁড়াইল, এক জোড়া শাড়ি গোষ্ঠর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিল, বউকে দিস।

সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠর সমস্ত আক্রোশ গিয়া পড়ে ওই বুড়ার উপর,

বাঘের মত লাফ দিয়ে ফিটারের উপর পড়িয়া হাতের নখ দিয়া যেন তাহার গলার নলীটা ছিঁড়িয়া দিতে চাহিল।

আজন্ম লোহা আর আগুনের সঙ্গে লড়াই করা সবল দেহ, কঠিন হাত দুইখানা লোহার মত কঠিন, ভাইস-যন্ত্রটার মত ওই হাতের কঠিন নিষ্করুণ পেষণে গোষ্ঠর হাত দুইখানা যেন মড়মড় করিয়া উঠিল, আপনা হইতেই গোষ্ঠর হাত দুইখানা শিথিল হইয়া পড়িল।

বুড়া আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আপন ঘরের বারান্দায় গিয়া উঠে, ভাবলেশহীন সেই নিষ্প্রভ কঠিন মুখ, একটি রেখারও ব্যতিক্রম নাই।

দুর্বল গোষ্ঠ এ-পাশে নিরুপায়ে গালি পাড়ে, লজ্জা করে না বুড়ো ভেড়া, পরের পরিবারকে কাপড় দিতে, এই দেখ্, তোর কাপড়ের কি দশা হয়, পুড়ুক আগুনে।

কাপড়খানা আগুনে দিবার জন্য সে হাতে করিয়া তুলে। ফিটার-বুড়া এতক্ষণে ঘুরিয়া আসিয়া বাধা দিয়া কহে, আরে বেটা, বাপ বেটীকে কাপড় দেয় না, তত্ত্বতল্লাস করে না?

হাতের কাপড় গোষ্ঠর হাতেই থাকিয়া যায়, সে হাঁ করিয়া ফিটার-বুড়ার মুখের পানে চাহিয়া থাকে, যেন কথাটা বুঝিতে পারে না। দামিনী নিঃসঙ্কোচে বাহির হইয়া আসে, মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন, মুখখানি বেশ দেখা যাইতেছিল, সে গোষ্ঠর হাত হইতে কাপড়খানা তুলিয়া লইয়া যায়, যাইবার সময় বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া বলিয়া যায়, বাবা এইখানে আজ খাবে তুমি।

গোষ্ঠ কাঁদে, আর থাকিতে পারে না।

ফিটারের ভাবলেশহীন মুখখানারও কেমন পরিবর্তন হইয়া যায়, উদাস দৃষ্টিতে শূন্যের পানে চাহিয়া থাকে, মনশ্চক্ষে কি যেন সে দেখে।

তারপর ধীরে ধীরে আপন মনেই বলে, আমারও একটি মেয়ে ছিল রে গোষ্ঠ, মা-মরা মেয়ে; এত রোজগার তখন আমার ছিল না, অভাবে খেতে না পেয়ে, অন্ধকূপের মাঝে থেকে সেও এমনই রোগা, ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, তারও এমনই ছেঁড়া কাপড় প'রে দিন গিয়েছে, শেষে সে—

কথাটা আর সে শেষ করিতে পারে না, স্বর কেমন ভারী হইয়া উঠে, ঠোঁট দুইটা কাঁপে, বুড়া আর কথা কয় না, ঠোঁট দুইটা টানিয়া কম্পন সে রোধ করিতে চায়, কিন্তু চোখের জল বাধা মানে না।

ছোট মিস্ত্রী আসিয়া সরাসরি আপন ঘরে প্রবেশ করে; ঘটনাটা সে বুঝিতে চায়।

ক্ষণপরে দিব্য হাসিমুখে আসিয়া গোষ্ঠকে কহে, এস টাইম হয়ে গেল যে।

গোষ্ঠ কহে, না।

সে কি হে, না কেন? আজ বিকেলে আবার—

না ভাই, ওতে হবেও না কিছু, আমি কাজই আর করব না। যে কাজ ক'রে রক্ত জল ক'রে খেটে দুটো মানুষের পেটের ভাত জোটে না, পরনের কাপড় জোটে না, সে কাজের মুখে ঝাঁটা; যাব না আমি।

ওর কণ্ঠস্বরে আক্ষেপের এমন করুণ প্রার্থনা ছিল যে, ছোট মিস্ত্রী পর্যন্ত বিচলিত না হইয়া পারিল না।

সবাই নির্বাক হইয়া বসিয়া ভাবে। ক্ষণপরে বড় মিস্ত্রী কহে, আচ্ছা মিস্ত্রী, আজ থেকে তো আর আমরা ওভারটাইম খাটব না, এ নিয়ে ধরে একটা ছোটখাটো ঝগড়া হবেই, এই সঙ্গে যদি মাইনে বাড়ানোর আরজিটা রাখা যায়—

ছোট মিস্ত্রী সোৎসাহে লাফ দিয়া উঠিয়া কহে, বহুত আচ্ছা, চল, চল সব, বলা যাক, মাইনে বাড়াতে হবে।

গোষ্ঠ কহে, হ্যাঁ, মাইনে বাড়াবে! বলে, কমাতে পেলে বাঁচে। মনের আগুন উহাদের কথায় লাগে, কণ্ঠ উত্তেজিত হইয়া উঠে, কোন অজানা অহেতুকী আক্রোশ বুকের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে।

ছোট মিস্ত্রী ওই কণ্ঠে বলে, আলবৎ বাড়াতে হবে, না বাড়ায় রইল কাজ। বাড়াবে না, চালাকি নাকি? এস তুমি। বিকেলে কি কাজ, এখুনি আমাদের সভা হোক; ওই বটতলায় এখুনি জমাট বস্তি করব, সব দিব্যি করিয়ে নোব, কি বল?

শেষ কথাটা বুড়া মিস্ত্রীকে বলিয়া তাহার মুখ পানে তাকায়।

বুড়া সেই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, সেই হিম মৃদু কণ্ঠে কহে, ডাক সকলকে, বাউরীদের সুদ্ধ।

গোষ্ঠ, ছোটমিস্ত্রী বিপুল উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়ায়।

বটতলায় দাঁড়ায় বড় মিস্ত্রী; একে একে শ্রমিকের দল আসিয়া জমিয়া যায়, মেয়ের দল, গাড়ি-বোঝাই-করা মুটের দল, গাড়োয়ানের দল; স্টেশনের জমাদার, বুড়া ড্রাইভার, পয়েণ্টসম্যান,—তাহারও আসে। মেয়েরা প্রশ্ন করে, কি, হবে কি?

ব'স ব'স, জমাটবস্তি হবে।

মেয়েরা বলে, ঢং নাকি, দুপুর রোদে জমাটবস্তি! চল, চল, কত কাজ প'ড়ে আছে, শেষে হাজরি পাব না।

গোষ্ঠ হাঁকে, যে যাবে, সে বুঝে যাক, আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই, রোগ হ'লে দেখব না, ম'লে ফেলব না!

মর্, তুই মর্ কেন রে মুখপোড়া, রোগ হ'লে দেখব না, দেখে তো সব উল্টে দিলে!

শোন সব।

বড় মিস্ত্রীর মোটা গলার আওয়াজ গমগম করে, কাহারও আর পা উঠে না, সব ফিরিয়া দাঁড়ায়।

বড় মিস্ত্রী বলে, যে সব আক্রা-বাজার চলেছে, তাতে আমাদের আর কুলোচ্ছে না।

চারিদিকে আলোচনা শুরু হইয়া যায়।

গাড়োয়ান-সর্দার বলে, যা বলেছ মিস্ত্রী, ঝিঙের দর দু' পয়সা ছিল, দু' আনা হ'ল।

আর একজন বলে, ন আনার কাপড়খানা, ন সিকে।

মেয়েরা বলে, পোড়ামুখোরা বলে আবার, যুদ্দু লেগেছে গো, যুদ্দু লেগেছে।

বুড়ি সাবী বলে, আমরাই দেখলাম মা, পয়সায় দু' সের ঝিঙে আট আনা দশ আনা চন্দ্রকোনা কাপড়। দু' পয়সা সের চাল, বাবা বলত—

ছোট মিস্ত্রী হাঁকে, চুপ চুপ।

তারপর উত্তেজিত আলোচনা।

কথা কিন্তু এক—বেশি মাইনে চাই আমাদের, বেশি মাইনে চাই। খেতে পাই না, পরতে পাই না।

আবার ঘুরিয়া আসে, বেশি মাইনে চাই।

একজন বলে, সে যদি ওরা না দেয়?

না দেয় ধর্মঘট হবে।

তা হ'লে ধর্মঘট?

মাইনে না বাড়ালে জরুর ধর্মঘট।

যে না করবে সে একঘরে।

ছোট মিস্ত্রী, গোষ্ঠ সকলের চোখ দিয়া আগুন ছুটিয়া যায়, একটা উত্তেজনার প্রবাহ বুকে বুকে বহিয়া যায়।

অন্তরতম প্রদেশের অতৃপ্ত মানবাত্মা, এমন ভাবেই বিরূপাক্ষের মত জটাজুট লইয়া জাগে চিরদিন!

কলের বয়লারের সিটিটা উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠে ভোঁ—ভোঁ।

গোষ্ঠ বলে, কে সিটি মারে রে?

একজন বলে, বোধ হয় বাবুরা কেউ।

গোষ্ঠ বলে, হাঁক হাঁক, হুকুম আজ শুনছি না।

বুড়া ফিটার, ছোট মিস্ত্রী, গোষ্ঠ এমনই কয়জন মাতব্বর শ্রমিক গিয়া অফিসের দুয়ারে দাঁড়ায়।

পিছনে কলের দুয়ারে বুভুক্ষু মজুরের দল।

বুড়া খাজাঞ্চী বলে, কোন্ নবাবের বেটার বিয়ে? কাজ কামাই ক'রে বটতলাতে হচ্ছিল কি?

কে একজন বলে, তোর বাবার বিয়ে, তুই নিতবর যাবি?

বুড়া ফিটার বলে, মালিকবাবুর সঙ্গে দেখা করব একবার।

যাও, যাও, কাজে যাও, এর পর দেখা ক'রো মালিকের সঙ্গে। অনেক কাজ কামাই হয়ে গেছে আজ। সব মাইনে কাটব জেনে রেখো।

একজন বলে, মাইনে কাটলে আজ তোমার····

সমবেত জনতা চেঁচাইয়া উঠে ধর্ ধর্, বুড়ো ভালুককে ধর্।

খাজাঞ্চী ঘরে গিয়া দরজায় খিল আঁটে, খোলা জানালা দিয়া দাঁত খিঁচাইয়া হাঁকে, পল্টু সিং! পল্টু সিং!

ম্যানেজার উপরের বারান্দায় আসিয়া হাঁকে, কেয়া হায়?

সমবেত জনতা চীৎকার করে, বেশি মাইনে চাই আমরা, খেতে পাই না, পরতে পাই না, আমরা বেশি মাইনে—

ম্যানেজার বড় মিস্ত্রী আর ছোট মিস্ত্রীকে ডাকিয়া লয়, তোম দুনো হিঁয়া আও।

সমবেত জনতা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকে।

পল্টু সিং আসিয়া ক্যাশঘরের দরজায় বসিয়া বন্দুকটা খুলিয়া পরীক্ষা করে, শেষে সেটা বাগাইয়া ধরিয়া চাপিয়া বসে।

বহুক্ষণ পর বড় মিস্ত্রী, ছোট মিস্ত্রী ফিরিয়া আসে।

বহু কণ্ঠ একসঙ্গে প্রশ্ন করে, কি হ'ল?

বড় মিস্ত্রী কিছু বলিবার আগেই ছোট মিস্ত্রী চেঁচায়, ধরমঘট, ধরমঘট।

জনতা চীৎকার করে, ধরমঘট।

পল্টু সিং বন্দুক ধরিয়া কহে, চলা যাও, কলসে নিকাল যাও।

কেউ তাকে দাঁত খিঁচায়, কেউ গালি পাড়ে।

বড় মিস্ত্রী বলে, সুরেনবাবু আর শিবকালীবাবুর জবাব হয়ে গেল।

উত্তেজনার প্রবাহে অসন্তোষের বহ্নিদাহ কলের পর কলে ছড়াইয়া পড়ে; সব বুকের মাঝে যেন বিস্ফোরক পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, আজ অগ্নি সংযোগে ফাটিয়া পড়িল; দলে দলে মজুর সব ধর্মঘট করিয়া বসিল।

কলগুলার চিমনিতে চিমনিতে আর ধোঁয়া ওঠে না, দুরন্ত যন্ত্রগুলা অসাড় নিস্পন্দ; দুয়ারে দুয়ারে গোর্খা পাহারা, নিষ্ঠুরতা মুখে মাখা, সমস্ত দেহখানা কর্কশ, কঠোর, কোমরে বাঁকা কুকরি, দিনের আলোয় শাণিত অস্ত্রটা চকচক করে, সারা অঙ্গ ব্যাপিয়া হিংস্র তীক্ষ্ণতা শোনিত তৃষ্ণায় লকলক করে।

মজুরের দল, প্রথম উত্তেজনায়, নিষ্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘষে, জয়ের জন্য জীবন পর্যন্ত পণ করে।

কিন্তু অন্ন, অন্ন!

অনাহার যে দুর্বল করিয়া দেয়; দীনের সম্বল—নাই, নাই আর নাই। দোকানে ধার দেয় না; বলে, জলে যা পড়েছে, তা পড়েছে, আর না বাবা, ফেল কড়ি মাখ তেল, আমি কি তোমার পর!

শিক-দেওয়া ঘেরা দোকানের দুয়ার বন্ধ করিয়া ভিতর হইতে কথা কয়। জ্ঞান যতক্ষণ থাকে মানের দায়ে পেটের দাহ সয়।

অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত উদরে সমস্ত অন্ত্রপাতি লাভা-স্রোতের মত টগবগ করিয়া ফুটে যেন।

কিন্তু অজ্ঞান শিশুর দল ক্ষুধার তাড়নায় চীৎকার করে, মায়ের বুকের দুধ রসহীন গাঢ় জমাট হইয়া উঠে, উহা বুঝি ক্ষীর নয়, মায়ের বুকের লহু, শিশুর মুখে বিস্বাদ ঠেকে, কচি গলায় পার হয় না।

শিবকালী সুরেন নানা স্থান হইতে ভিক্ষা করিয়া আনে।

আপন সঞ্চয়ের ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় বড় মিস্ত্রী, সুবল দেয় আপন দোকান, ছোট মিস্ত্রী আপনার সেই সাধের ঘড়িটা দেয়।

বুড়া ড্রাইভার চাঁদা দেয়, জমাদার দেয়, সবাই কিছু কিছু দেয়; দিতে পারে না গোষ্ঠ, একটু তাহার বুকে বাজে, দামিনী কোন গুপ্ত স্থান হইতে বাহির করে সেই জীর্ণ বালা দুইগাছা, বলে, দিয়ে এস।

গোষ্ঠ মুখের পানে চায়।

দামিনী কহে, ওই ছেলেদের শুকনো গলায় আট আনার দুধ তো পড়বে; তাই আমার সে পাবে।

জ্বলন্ত শুষ্ক বুকের মাঝেও আজ যেন সেই সচ্ছল দিনের তরুণ গোষ্ঠটি ফিরিয়া আসে, অতি আদরে সে আজ দামিনীকে বুকে

লয়, শুষ্ক পাংশু অধরে একটি চুম্বন আঁকিয়া দেয়, রুক্ষ চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে।

দামিনী একটু মিষ্ট হাসে।

এক সপ্তাহ। দুই সপ্তাহ। আরও পাঁচদিন।

দুর্ভিক্ষ করাল গ্রাসে হা হা করিয়া জাগে; হা-হা, অন্ন অন্ন, একমুঠা অন্ন; এত কটি ক্ষুদ, হা-হা।

মুখের লালা আঠা বাঁধিয়া যায়, জিভ চটচট করে, আর রব বাহির হয় না, মা চেঁচায়, বাপ চেঁচায়, ছেলেগুলা চেঁচায় না, অতি কষ্টে ধুক-ধুক করিয়া বাঁচিয়া থাকে, ধরণীর মমতায় জীবন কঙ্কালের আশ্রয়টুকু ছাড়িতে পারে না।

প্রাণের চেয়ে মান বড়, এ দর্শনবাদ মানুষের আবিষ্কৃত, এ তাহার স্রষ্টার উপরে সৃষ্ট, মানুষের জন্মগত সংস্কার হইতেছে মরণ হইতে জীবনকে বাঁচানো—দুনিয়ার সর্ব ধর্ম সর্ব দ্রব্যের বিনিময়ে আপন অস্তিত্ব জীব বজায় রাখিতে চায়; সৃষ্টি হইতে এই নগ্ন সত্যটাকে মানুষের ইতিহাস প্রমাণ করিয়া আসিয়াছে।

মানুষের আবিষ্কৃত এই দর্শনবাদ; এই সংস্কারের আধার মানব-সভ্যতা।

সভ্যতায় বঞ্চিত শ্রমিকদের উদরের জ্বালা অসহ্য হইয়া উঠে।

দরিদ্র-দলের জন কয়েক উদরের জ্বালায় আবার গিয়া ধনীর দুয়ারে লুটাইয়া পড়ে, কাজ দাও, কাজ দাও, খেতে দাও, এক মুঠা চাল, এক মুঠো ক্ষুদ।

উপর হইতে ম্যানেজার হাঁকে, ভাগো, ভাগো, নেহি মাংতা হায়, চাই না, চাই না তোদের।

এরা তবুও চেঁচায়, কাজ দাও, দয়া কর মালিক, খেতে দাও।

গুর্খার দল কুকরি উঠাইয়া তাড়া দেয়।

গোষ্ঠ, ছোট মিস্ত্রী, কলের মিস্ত্রী, ফায়ারম্যান—এমনই জনকতক বিবরে রুদ্ধ সাপের মত গর্জায়, পেটের আগুনের শিখা অনশন-রুক্ষ চোখের শিখায় নাচে।

উন্মাদের মত বেইমানদের শাস্তি দিতে তাহারা বাহির হয়, হাতে কাহারও হ্যামার, কাহারও হাতে লোহার ডাণ্ডা, যেন শূলহস্তে রুদ্রের অনুচরের দল!

ধনীর প্রসাদভিক্ষু মজুর-দলের পথ আগলাইয়া ছোট মিস্ত্রী হাতুড়ি উঁচাইয়া কয়, কেন গিয়েছিলি তোরা ধরমঘট ক'রে?

হাঁপানী-রুগী বাবুলাল টানিয়া টানিয়া কহে, কেন গিয়েছিলি, কে—ন গিয়েছি—লি! খেতে দিবি, দিবি? তোরাই তো এই করলি, দে, খেতে দে, দে দে।

উদরের জ্বালায় হিংস্র পশুর মত সে ছোট মিস্ত্রীর দিকে ছুটিয়া আসে। ছোট মিস্ত্রীরও সকল সঞ্চিত ব্যর্থ ক্রোধ গিয়া পড়ে ওই নিরীহের উপর, হাতের হ্যামারটা উন্মত্তের মত হানিয়া, ছোট মিস্ত্রী হাঁকে, খবরদার!

ব্যস, ওই এক ঘায়েই শেষ, মাথার খুলিটা ডিমের খোলার মত ফাটিয়া রক্তে মজ্জায় সে এক ভীষণ দৃশ্য।

তবুও উহার ওই জীর্ণ পাঁজরা কয়খানা ধোঁপে, জীবনটা যেন ওই কয়খানা পঞ্জরের মমতা ছাড়িতে চায় না।

দুর্বলের দল চীৎকার করিয়া উঠে, দেখিতে দেখিতে দুই দলেই লোক জুটিয়া যায়, তারপর একটা ভীষণ, ঘৃণিত অধ্যায়।

পশুর মত এ উহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরে, ও উহার মাথা ফাটাইয়া

দেয় ; ইট, পাটকেল, লাঠি। প্রেতের মত তাণ্ডব নাচে সব। আর্তের চীৎকার, প্রেতের মত উল্লাস।

দেখিতে দেখিতে পুলিস আসিয়া পড়ে, তখন সব পালায় ; ছোট মিস্ত্রী পর্যন্ত।

স্থানটা খালি হইলে দেখা যায়, রক্ত, মাংস, মজ্জায় স্থানটা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে,আর কয়টা দেহ, ভয়ার্ত শরণার্থীর দলের কয়টা—বাবুলাল আর দুইজন, উন্মাদের দলের দুইটা—গোষ্ঠ আর একজন।

হাসপাতালে গোষ্ঠ মরিতে যায়, পাশে শিবকালী দাঁড়াইয়া। গোষ্ঠ অতি যাতনায় গোঙায়, তবু মাঝে মাঝে পেটের জ্বালায় আক্রোশে চীৎকার করে, জান দেগা, লেকেন নেহি যায়গা।—বলিয়া প্রলাপের ঘোরে উঠিতে গিয়া সহসা বিছানায় লুটাইয়া পড়ে।

ডাক্তার ও-ঘরে চলিয়া যায়।

কম্পাউণ্ডার হাতে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, করুণায় একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলে, কহে, কি যে ফল হ'ল, মরতে গরিবই ম'ল।

অদূরে তখন রেললাইনের ধারে কয়টা কুলির ছেলে ধর্মঘটের খেলা খেলিতেছিল, মাটির কলের উপর লাঠি চালাইয়া একদল কহিতেছিল, তোড় দিয়া, তোড় দিয়া।

সেই দিক পানে চাহিয়া শিবকালী আপন মনেই বলে, চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি, অগ্রদূত কালবৈশাখীর।